শিল্প সাহিত্য পত্রিকা

কলি খাতা

বিষয়: ডাস্টবিন

দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা

শিল্প সাহিত্য পত্রিকা

কলি

খাতা বৈশাখ ১৪২৪

দ্বিতীয় বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

সম্পাদকের কথা

গদ্য
বিপ্লব মাজী, যশোধরা রায়চৌধুরী, সুকান্তি দত্ত
তন্বী হালদার, স্বাতী গুপ্ত, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

কবিতা
প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, বাসব দাশগুপ্ত, সুমনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ দাস
বিজয় দাস, শোভন মন্ডল, চয়ঞ্জীব শূর, কৌশিক গাঙ্গুলী, সোমনাথ ব্যানার্জী

গল্প
সাধন চট্টোপাধ্যায়, শুভংকর গুহ, তৃষ্ণা বসাক, ঝুমুর পান্ডে, তন্বী হালদার

স্যাটায়ার
তৃপ্তি সান্ত্রা, রাহুল দাশগুপ্ত

ফিরে পড়া
সত্যপ্রিয় ঘোষ, শচীন দাশ

আঁকিবুকি
বিদিশা মৌলিক, অরুপ পাল, সংযুক্তা পোদ্দার
প্রিয়া রায়, অন্বেষক দাঁ, অভিরূপ মৈত্র
অরিন্দম সরকার, বিশ্বজিৎ দেবনাথ
অভিজিৎ দাস, লাকি মুখার্জী
সায়ন সাফুই, সুখেন্দু কুন্ডু

শিল্প সাহিত্য পত্রিকা

কলিখাতা

সম্পাদক
বিজয় দাস

যুগ্ম সহ-সম্পাদক
ঋষভ চৌধুরী, সুদীপ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ
অগ্নিমিত্র দাস

অলংকরণ
গদ্য - সুদীপ চক্রবর্তী
কবিতা - কণিনিকা দাস, আলোকপ্রাপ্ত দাস

যোগাযোগ
৩/৩৩/১, সারদা ব্যানার্জী রোড, চরকতলা, কলকাতা-৭০০১১১
চলভাষ ঃ ৯৮৩০৩১৯৩৮৯
Email : kolikhata@gmail.com
Blog : www.kolikhata.wordpress.com
Website : www.kolikhata.in

অক্ষর বিন্যাস ঃ সিদ্ধার্থ দে (৯৮৩৬০৩৬১৩৩)

মুদ্রণ ঃ জয়গুরু উদ্যোগ, ৫৯, সূর্যসেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

পরবর্তী সংখ্যা ঃ সম্পর্ক

প্রাপ্তিস্থান
কলেজ স্ট্রীট ঃ পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু
রেলওয়ে বুক স্টল ঃ দমদম, বিরাটী, বেলঘরিয়া
এছাড়াও ৯৮৩০৩১৯৩৮৯, ৮৯৬১২১৮৮৯১

সম্পাদকের কথা

'ডাস্টবিন' আধুনিক মানব সভ্যতার সর্বাধিক ব্যবহৃত বস্তু। আগুন যদি আদিম মানুষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ডাস্টবিন হল অত্যাধুনিক সভ্যতার মহান সৃষ্টি। আজকের সভ্যতা ডাস্টবিন ছাড়া অচল। একবার ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যদি ডাস্টবিন না থাকত তাহলে এত মেকি সম্পর্ক, মুখের হাসি, ছেলেবেলার কাঁটা-কুঁটি খেলা, সভ্যতার অগ্রগতিতে মুখ থুবড়ে পড়া মানুষ, প্রতিদিনের ক্লান্তি, গালিগালাজ, ভদ্রতা, এত স্মৃতি, কোথায় ফেলত মানুষ। ডাস্টবিনের কল্যাণে মানুষ আজ মুক্ত। ঝাড়া হাত-পা। খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেই চোখে পড়ে এর বহুল ব্যবহার। বাতিল নোট থেকে সদ্যজাত শিশু, ধর্ষিত শরীর থেকে কন্ডোম সবকিছুরই শেষ আশ্রয় ডাস্টবিন। এখন তো আবার বাঁশিয়ালা ডাস্টবিন প্রতিদিন বাড়ি বয়ে নিয়ে যায় আবর্জনা। সকাল সকাল মনের জঞ্জাল, গ্লানি ডাস্টবিনে ঝেড়ে ফেলে পরিষ্কার ভাবে প্রস্তুত হতে হয় প্রতিদিনের প্রতিযোগীতায় অংশ নিতে। 'ডাস্টবিন' সব দিক দিয়েই কল্যাণকর। কিছু সংখ্যক মানুষ যেমন তাদের অপ্রয়োজনীয় বস্তু ডাস্টবিনে ফেলে হয় আবর্জনা মুক্ত তেমনি কারোর কাছে পাঁচতারা রেস্তোরাঁ।

কখনও কল্পনা করতে বেশ লাগে, যদি ডাস্টবিন একটি প্রাণী হত। সকল আবর্জনা, জঞ্জাল, অপ্রয়োজনীয় পরিত্যক্ত বস্তু বয়ে নিয়ে চলেছে উন্নত সভ্যতার দিকে। ব্যস্ত সমাজে তার মতো ব্যস্ত আর কেউ নয়। সভ্যতা যত খোলস পরিবর্তন করে উন্নত হচ্ছে, ডাস্টবিন তত ঝুঁকে পড়ছে খোলসের ভারে। মনের দুর্গন্ধ ঢেকে আজও বাইরের মেকি হাসিই তার ভরসা। এই ভাবেই যুগ যুগ ধরে হাসি মুখেই বয়ে বেড়াতে হবে সকল আবর্জনা।

আজকের মহাভারতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠীর দাঁড়িয়ে স্বর্গদ্বারে, পুষ্পক রথের অপেক্ষায়। নীচের ডাস্টবিন সম সমগ্র পৃথিবী চোখের সামনে। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তার আত্মীয়-অনাত্মীয় প্রিয়জনদের স্তূপাকৃত লাশ। মাছিদের ভিড়ে শরীরগুলো ঝাপসা। কাকগুলো ক্রমাগত ঠুকরে চলেছে। পশ্চিমের আকাশে শকুনের আমন্ত্রণ বার্তা। শেষ যাত্রার একমাত্র সঙ্গী কুকুর রূপি ধর্মও একছুটে ভিড়ে গেল অন্য ককুরদের সাথে। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। পুষ্পক রথ এল, কিন্তু ভিড়ের ঠেলায় আর ওঠা হয়ে উঠল না।

'কলিখাতা'-র প্রতিটি সংখ্যা নতুন ভাবনায়, নতুন রূপে পাঠকদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে। তাই এই তৃতীয় সংখ্যায় আত্মপ্রকাশের ভাষা 'ডাস্টবিন'। যেখানে নির্বাচিত লেখকমণ্ডলী সুকৌশলে রূপদান করেছেন এই ভাবনাটির। কোথাও তুলে ধরা হয়েছে ডাস্টবিনের ইতিহাস, কোথাও সুদূর ভবিষ্যতে ডাস্টবিনের অভাব মেটাতে নতুন গ্রহের সন্ধান, আবার বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়ের ডাস্টবিন। কখনও শহরের ডাস্টবিনের বিরুদ্ধে গরুদের একত্রিত আন্দোলন, তো আবার নিজেকে ডাস্টবিনের সমান ভেবে কুড়িয়ে বেঁচে থাকা এক মেয়ের গল্প। এবারের শ্রদ্ধাঞ্জলি দুই প্রয়াত লেখককে, 'ফিরে পড়া'য় বিশেষ পাওয়া তাদের দুটি গল্প। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মানুষের জীবন সবকিছুতেই ডাস্টবিনের ছোঁয়া। এই সবকিছু নিয়েই ''কলিখাতা'' তুলে ধরতে চেষ্টা করেছে 'ডাস্টবিনের' বিভিন্ন রূপ। আপনারা পড়ুন, আলোচনা-সমালোচনা করুন, সাথে থাকুন। সাহায্য ও সহযোগিতায় সকলকে ''কলিখাতা''-র ধন্যবাদ।

ডাস্টবিন

বিপ্লব মাজী

কোন আবর্জনা ফেলার জায়গাকে ডাস্টবিন বলে। এই ইংরেজি শব্দটি বাংলা ভাষায় ডাস্টবিন নামেই পরিচিতি পেয়েছে। যখন আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকে শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রযুক্তি ও অর্থনীতির উন্নতি গ্রাম ও শহরের তফাৎটা ক্রমাগত স্পষ্ট করতে থাকে, বিভিন্ন শহরকে কেন্দ্র করে দেখা দিতে থাকে সভ্য নাগরিক সমাজ বা সিভিল সোসাইটি। শহর তো গ্রাম না, যে যেখানে সেখানে মলমূত্র ফেলা যাবে, আবর্জনা ফেলা যাবে। অতএব শহরকে কেন্দ্র করে, নাগরিকদের সুযোগ সুবিধে দেওয়ার জন্য তৈরি হল এক একটি মিউনিসিপ্যালিটি, আর যেখানে যেখানে একটা বড় শহরের পেটের ভেতরে দশ-বিশটা ছোট শহর ঢুকে গেল, তৈরি হল কর্পোরেশন। এইসব মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থা, নালা-নর্দমা-পায়খানা (যার বর্তমানে গালভরা নাম টয়লেট বা ওয়াশ-রুম) ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা জোরদার করতে হল, তা না হলে শহরে জমা আবর্জনার দুর্গন্ধে শহর ছেড়ে মানুষ গ্রামে পালাত। স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকলে, শহরের আবর্জনার স্তূপ থেকে নানা রোগ মহামারি ছড়াত। শিল্প বিপ্লবের আগে ও পরে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আমরা পাই, বেশ কিছু নগর ও শহর প্লেগ মহামারিতে ধ্বংস হয়ে গেছে। আজ থেকে (২০১৭) একশ বছর আগেও, পৃথিবীর নগর জীবন প্লেগ মহামারিকে ভীষণ ভয় পেত। যার একটি দৃষ্টান্তমূলক বিবরণ আলবার্ট কামুসের দ্য প্লেগ উপন্যাসে আছে। সে যাই হোক, যে কোন শহর জীবনে প্রতিদিন প্রতিটি গৃহস্থে যে আবর্জনা জমে, তা ফেলার জায়গা হল পথের ধারের ডাস্টবিন। মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন শহরের মোড়ে মোড়ে বা বিশেষ বিশেষ স্থানে ডাস্টবিন-এর ব্যবস্থা করেন। সেই ডাস্টবিনে নাগরিকরা যে আবর্জনা ফেলেন, তা মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনের গাড়ি এসে পরিষ্কার করে তুলে নেয়। তারপর শহরের বাইরে কোন স্থানে ফেলে আসেন। সাধারণত শহরের সমস্ত ময়লা এক জায়গায় ফেলে আসার স্থানটিকে বলা হয় ধাবা।

শৈশবে (১৯৫৩-৫৪) গ্রাম থেকে যখন মেদিনীপুর শহরে এলাম শহরটি তখন ৪ x ৪ বর্গমাইল মাত্র। ছোট শহর। শহরের সব রাস্তাই মোরামের। পথে পথে তেকোনা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলে। কাঁধে সিঁড়ি, মাথায় বা ঘাড়ে কেরোসিনের টিন একটি লোক পথে পথে বাতি জ্বেলে যায়। সে বাতির নিষ্প্রভ আলো যতক্ষণ বাতিটিতে কেরোসিন থাকে জ্বলে। তখন দেখতাম শহরের পাড়ার মোড়ে মোড়ে এক একটা গোলাকৃতি টিনে ঘেরা পরিসর ডাস্টবিন। পাড়ার সবাই সে ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলে। হপ্তায় একদিন মিউনিসিপ্যালিটির লরি এসে ডাস্টবিন থেকে আবর্জনা তুলে নিয়ে, শহরের বাইরে ধাবায় ফেলে আসে। দেখতে দেখতে ধাবা হয়ে ওঠে আবর্জনার পাহাড়। মেদিনীপুর শহরের প্রান্তিকে ধর্মার ওধারে যে কলকাতা-মুম্বাই হাইওয়ে ছেদ করে রানিগঞ্জ সড়ক চলে গেছে, তার পাশে ধাবা। একসময় কংসাবতীর ব্রিজ হয়ে যাত্রী গাড়ি শহরে সরাসরি না ঢুকে, যখন রানিগঞ্জ সড়ক ধরে ধর্মা হয়ে শহরে প্রবেশ করত। ধাবার দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসত। বর্তমানে নানা রাসায়নিক ব্যবহার করে, ধাবার দুর্গন্ধ দূর করা হয়, যার ফলে ধাবার কাছেই ইতিমধ্যে আবাসন ও হোটেল-লজ তৈরি হয়ে গেছে। অদূর ভবিষ্যতে ধাবাও হয়ত শহরে ঢুকে যাবে। আমরা বলি ধাবা, আসলে ওটাও তো একটা বেশ বড় আকারের ডাস্টবিন। কলকাতার মতো বড় শহর বা কর্পোরেশনের সমস্ত ময়লা যেখানে শত শত গাড়িতে নিয়ে গিয়ে উগরে ফেলা হয়, সেই ধাবার পাশেই তো সায়েন্স-সিটি, রুবি হাসপাতাল, দিশান, রিয়েল এস্টেটের ছড়াছড়ি, মিলন মেলা, আরো কত কি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ কলকাতা কর্পোরেশনের ধাবা বা ময়লা ফেলার বড় ডাস্টবিনকে দুর্গন্ধ ও দূষণ মুক্ত করে ফেলেছে। নগর সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে ডাস্টবিনের চেহারা বদলে যাচ্ছে। গোলাকৃতি টিনের ঘেরা পরিসর থেকে চারপাশ সিমেন্টের দেয়াল ঘেরা ডাস্টবিন চালু হল। ডাস্টবিন থেকে আবর্জনা তোলার যন্ত্রপাতি, কৃৎকৌশলও দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে। মানুষকে আগে যেভাবে ডাস্টবিনের আবর্জনার

ময়লা ঘেঁটে গাড়িতে তুলতে হত। এখন সে কাজ অনেকটাই যন্ত্র করে দেয়। ভবিষ্যতে হয়ত রোবটরা ময়লা তুলবে।

বিগত শতকের নয়ের দশকে বিশ্বায়নের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত। ডাস্টবিন প্রধানত আমাদের নগরজীবনের পাবলিক স্ফিয়ারে ছিল। শিল্পবিপ্লব শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ঘটায়নি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পশ্চিম ইউরোপ থেকে জাহাজ ভাসিয়ে দেশে দেশে উপনিবেশ তৈরি করেছিল, আর সেইসব উপনিবেশে ঔপনিবেশিক প্রভুরা বাজার তৈরি করেছিল, যাতে যন্ত্রে তৈরি প্রভূত মাল পণ্য হিসেবে দেশে বিক্রি হয়। সে ছিল উপনিবেশ তৈরির যুগ। আর এই বিশ্বায়নের দ্বিতীয় পর্বও এক নতুন ধরনের উপনিবেশ তৈরির যুগ। যারা তা তৈরি করছে দৃশ্যতই অদৃশ্য। পৃথিবীর মুক্ত বাজারে পণ্যসম্ভার বিক্রি করে দ্রুত ধনী হওয়ার জন্য তারা মুক্তবাজারে বা ওপেন-মার্কেটে নিত্য নতুন মডেল ও পণ্য সরবরাহ করছে। আগে যেমন একটা সাইকেল তিন প্রজন্মের মানুষ ব্যবহার করত, বর্তমানে একজন মানুষ পাঁচ বছরে পাঁচটা নতুন নতুন মডেলের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। ফলে প্রতি বছর কোটি কোটি কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন মার্কেটে যেমন আসছে, কোটি কোটি পণ্যসম্ভার ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে! ডাস্টবিনেরও মডেল বদলে যাচ্ছে। ডাস্টবিন এখন শুধু আর পাবলিক-স্ফিয়ারে ব্যবহার করা হয় না। প্রাইভেট- স্ফিয়ারেও ব্যবহার করা হয়। যেমন আমার স্টাডিতে ১২ ইঞ্চি উচ্চতা ও ৮ ইঞ্চি চওড়া ধুসর রঙের একটি ডাস্টবিন আছে। দৃশ্যতই সুন্দর মডেল। আমাদের দুটো বেড রুমে এবং হলঘরেও আছে। পলিমার ও অন্য ধাতুর মিশ্রণে তৈরি এইসব ডাস্টবিন বর্তমানের নাগরিক জীবনে অপরিহার্য। ডাস্টবিনকে পণ্য করেও যে বহুজাতিক ব্যবসা সারা পৃথিবী জুড়ে করা যায়, এ তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। এইসব সুদৃশ্য ডাস্টবিন আজ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করছে, না করে উপায় নেই এক ডাস্টবিন থেকে অন্য ডাস্টবিনে, সেখান থেকে অন্য ডাস্টবিনে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

আপতদৃষ্টিতে যে ডাস্টবিন ছিল একটি শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার স্থান বা পরিসর—সবার অলক্ষ্যে সেই ডাস্টবিন-প্রকল্প বা ধারণাটি বর্তমান মানব সভ্যতার বাঁচা-মরার ডিসকোর্স তৈরি করছে। ডাস্টবিন না হলে এই মানব সভ্যতা ভয়ঙ্কর এক ধ্বংসের মধ্যে প্রবেশ করবে। নিছক ৬ ফুট বাই ৫ ফুট ডাস্টবিনের বদলে আজ আমাদের চাই মহাজাগতিক ডাস্টবিন, না হলে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার দূষণের প্রভাবে যে বিশ্ব-উষ্ণায়ন ঘটবে, একদিন সমগ্র পৃথিবীতে স্প্রেংলার কথিত নীরব বসন্ত এসে যাবে, পৃথিবী একখণ্ড পাথর হিসেবে থাকবে, সেখানে কোন মানবসভ্যতা থাকবে না।

২

এবার এক অন্যধরনের ডাস্টবিনের কথা বলব। যে কোন কম্পিউটার খুললে মনিটরের পর্দায় আমরা রিসাইকেল বিন নামে একটি লোগো দেখতে পাই। একে বলে ই-ডাস্টবিন। আমাদের অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলোকে আমরা এই ডাস্টবিনে পাঠিয়ে দিই, যাতে কম্পিউটার প্রোগ্রাম ফাইলের ভারে ক্লান্ত না হয়ে পড়ে। অবশ্য রিসাইকেল বিন ডাস্টবিনে পাঠানো ফাইলগুলো, যে গুলো ই-আবর্জনা তা আবার প্রয়োজনে ফিরিয়ে আনা যায়, যদি না সেগুলো চিরতরে ডিলিট করে দিই। অন্যদিকে যখন ইন্টারনেটের কোন মেল বক্সে যাই, সেখানে কম্পিউটারে আসা জাঙ্ক মেল ও ট্র্যাশমেলের দুটো ডাস্টবিন দেখা যায়। কম্পিউটারের পক্ষে দূষিত ফাইলগুলো এই ডাস্টবিন দুটো ধরে রাখে। তাদের মূল ই-মেল বক্সে আসতে দেয় না। অনেক সময় এই দুটো ডাস্টবিনে আটকে থাকা ফাইল আমরা আস্তাকুঁড় থেকে খুঁজে নিই এবং ফাইল খুলে প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন দেখে নিই। অনেক সময় কম্পিউটারের হার্ড-ডিস্ক যেসব সমস্যা তৈরি করে, বা কম্পিউটার প্রোগ্রামে গন্ডগোল দেখা দেয়। তার কারণ কম্পিউটারে জমা ঐ সব আবর্জনা—যাকে আমরা অনেক সময় ভাইরাস বলি। এই ভাইরাস বা আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য কুইকহিল বা অন্য কোন অ্যান্টি ভাইরাস প্রোগ্রাম লোড করি। এইসব প্রোগ্রাম ই-ডাস্টবিনের আবর্জনা দূর করে।

আমরা অনেকেই জানি না, কম্পিউটার যেমন মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে নানাভাবে সাহায্য করছে, মানব ও পশুপাখি, উদ্ভিদের জীবনে নানা বিপর্যয় ডেকে আনছে। আমাদের অজ্ঞাতসারেই ই-আবর্জনার বিষ আমাদের ডিজিটাল যুগকে বিষাক্ত করে তুলছে। ইলেকট্রনিক আবর্জনা পানীয় জলে শুধু বিষ ছড়াচ্ছে না, পৃথিবীর ইকো-সিস্টেমের ক্ষতি করছে। যার ফলশ্রুতি পানীয় জলের ভান্ডার কমে আসছে, প্রাণী-উদ্ভিদ-জীবজগৎ তাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছে। কেননা সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ টন ই-আবর্জনা দিনে দিনে পৃথিবীটাকেই ডাস্টবিনে রূপান্তরিত করছে। বিষাক্ত পদার্থের ডাস্টবিন। একটা তথ্য বলছে শুধু ২০১২ সালেই পৃথিবীতে ১.৬ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি) তৈরি হয়েছে। আর্সেনিক, সীসা, পলিব্রোমিনেটেড ফ্লেম রিটারডেন্টস-এর মতো নানা বিষাক্ত পদার্থ যেগুলিতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিবছরই বাজারে এইসব ইলেকট্রনিক্স পণ্যের নতুন নতুন মডেল আসছে আর পুরোনো মডেল বাতিল হয়ে পৃথিবীকে আস্তাকুঁড়ে রূপান্তরিত করছে। বিশেষত গরিব তৃতীয় দুনিয়াকে, কেননা অর্থনীতিতে উন্নত ধনী দেশগুলি নিজেদের দেশের পরিবেশ আইন থেকে মুক্তি পেতে কম্পিউটার, সেলফোন ও অন্যান্য

ইলেকট্রনিক পণ্যের কারখানা বা প্লান্ট তৃতীয় দুনিয়াতে স্থাপন করছে। পশ্চিমি উন্নত দুনিয়ার কাছে তৃতীয় দুনিয়া হল আস্তাকুঁড় বা ডাস্টবিন! ই-আবর্জনার বিষ সম্পর্কে উন্নত দুনিয়া সচেতন হলেও—আমরা না। পশ্চিমি দুনিয়ার নাগরিক সমাজের পরিবেশ সচেতনতা, পরিবেশ আন্দোলন থেকেই আমরা বুঝতে পারছি তৃতীয় বিশ্বের ডাস্টবিনে কি পরিমাণ ই-আবর্জনা জমছে। প্রতি বছরই ই-আবর্জনার স্তূপ বাড়ছে। ই-পণ্যের বিশ্বায়িত বাজার যত বাড়বে ই-আবর্জনাও বাড়বে এবং বিষবাষ্পে পৃথিবী ভরে উঠবে।

৩

যখন বিদ্যালয়ের কিশোর প্রতিবারে ষান্মাষিক বা বাৎসরিক পরীক্ষায় একটি রচনা আসার উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকত : বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ। বড় হয়ে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি বিজ্ঞানের দুটি রূপই সমান শক্তিশালী। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে বিজ্ঞান যেমন আশীর্বাদ, অভিশাপও। পাথরযুগে আমরা পাহাড়ের গুহায় বসবাস করতাম এখন আকাশচুম্বি হাইরাইজের গুহায়! এবার যে ডাস্টবিনের আবর্জনার কথা বলব সেটি একটি ভয়ঙ্কর ডাস্টবিনের আবর্জনা। সাদামাটা ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে নিউক্লিয়র-আবর্জনা বা পরমাণু-আবর্জনা। আকাশে, ভূ-গর্ভে বা সমুদ্রে পরমাণু বিস্ফোরণের পর যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ে তাকে আমরা বলি তেজস্ক্রিয় ধুলো ও ছাই। আকাশে যা পাইরোকিউমুলাস মেঘ তৈরি করে আর যে মেঘ থেকে কালো-বৃষ্টি মাটিতে নেমে আসে! এই মেঘ বা কালো-বৃষ্টি তেজস্ক্রিয় দূষণে জীবজগতকে সংক্রামিত করে ও তাদের ধীরে ধীরে মৃত্যু ডেকে আনে বা দেহে বিকৃতি ঘটায়। নদী ও সাগরের জলকে দূষিত করে। মাঠে মাঠে শস্যে বিষ প্রবেশ করে। আবহাওয়া ও জলই যদি দূষিত হয়ে যায়—মানুষ কি করে বাঁচবে? পরমাণু বোমার বজ্র নির্ঘোষের বৃষ্টি তো তেজস্ক্রিয়কণার বৃষ্টি। বর্তমানের পরমাণু বোমার তুলনায় হিরোসিমায় ও নাগাসাকিতে যে দুটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তারা খেলনা বোমা। আমরা রেডিয়েশন সংক্রামিত হলে আয়ু দ্রুত কমে আসে। ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে, উর্বরতা শক্তি কমিয়ে দেয়, জেনেটিক মানচিত্রে বদল ঘটিয়ে দেয়। নারীগর্ভে থাকা শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়, বিশেষভাবে শিশুরা আক্রান্ত হয়। এই তেজস্ক্রিয় আবর্জনা ফেলার মতো অন্য যেসব ডাস্টবিন তৈরি হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় নগন্য। অনেকেই জানেন না পরমাণু বোমাগুলির নির্দিষ্ট আয়ু আছে, আয়ু কাল ফুরিয়ে গেলে সেগুলি মৃত বা শবদেহ, আমাদের এই গদ্যের ভাষায় আবর্জনা। এই আবর্জনা ফেলার ডাস্টবিন ভূ-গর্ভ বা সমুদ্র-গর্ভ। আকাশে বা বাতাসে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটালে সেই আবর্জনার ধুলো বা মেঘ শুধু গরিব তৃতীয় দুনিয়াকে গ্রাস করবে না, ধনী পশ্চিমি দুনিয়াকেও গ্রাস করবে, ফলে বিজ্ঞানীরা আজকাল স্থলে পরমাণু বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে জলে বা ভূগর্ভে ঘটান। সাম্প্রতিককালে মৃত পরমাণু বোমাগুলির অবশিষ্ট তেজস্ক্রিয় বিকিরণের হাত থেকে বাঁচতে সেগুলিকে উপগ্রহের সাহায্যে মহাকাশে পাঠিয়ে দেবার কথা ভাবা হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষ মহাকাশকেও ডাস্টবিন বানাতে চাইছে। বলা যায় না, কোনদিন হয়ত শুনব মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর আবর্জনা ফেলার ধাবা হয়ে গেছে। পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত রকেটগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ বোঝাই ই-আবর্জনা, পরমাণু-আবর্জনা সেখানে বয়ে নিয়ে যাবে।

এই হৃদয় আসলে ডাস্টবিন

যশোধরা রায়চৌধুরী

একদিন দুদিন ভাল লাগা, তারপর হতাশা, সবকিছু পরিত্যাজ্য ডাস্টবিনে। সময়ের ডাস্টবিন। উপচিয়া উঠিয়াছে। একের পর এক ফেকু ফেলিতেছি। মুহূর্তিক ফেকু কথাবার্তা, চেনাশোনা। বিতণ্ডা। তর্ক। অনেক আদুরে চাহনি। প্রশংসা। প্রশংসার আয় মাত্র পনেরো সেকেন্ড। তাহার পর স্তুতি। শ্রদ্ধা। প্রণাম। নাম মাহাত্ম্য। তাহার পর ফেকু প্রেম ভালবাসা। কিছুটা মাখোমাখো, কিছুটা অন্যমনস্ক।

এই সবকিছুর ভেতর দিয়ে চলিয়া যাইতেছে আয়ু।

আমার সমস্ত দিন কাটিয়া যাইতেছে, ঘষঘষ। সে সময়ের অনেকটাই কাটিতেছে ফেসবুক, ওয়াটস্যাপ, তাহাদের সূক্ষ্মতম ছুরিকায়।

এই সময়যাপনের ভেতর কোন স্থিতুভাব নাই। নাই কোন দীর্ঘকালীন আরাম বা ক্ষান্তি। নূতন উত্তেজনা, নব নব ক্লান্তির উপাদান আছে। নিজেদের ঘুমচোখকে বিস্ফারিত করিয়া দিবে এমন অশ্লীল কিছু, মজার কিছু। মজা, মজা, অনেক মজা চাহিয়া ফেকুগণ একেবারে আত্মহারা।

আজ মিস্টার ফেকুর জন্মদিন। ফেকুর দেওয়ালে আজ অনেক হাতের ছাপ পড়িবে, HBD, MHROD। আজ ফেকুস্যার সাজিয়া গুজিয়া ছবি তুলিবেন। প্রোফাইল পিক পাল্টাইলে ১০০ আপ লাইক পড়িবে। কেহই জানিবে না, ফেকুর বয়স ৫৫ ছাড়াইয়াছে, চুলে কলপ তো দিয়াই থাকেন, তাহার সহিত অ্যাড হইবে ফোটোশপের কালির পোঁচ আর গালের ফ্যাট কিছুটা ছায়াচ্ছন্ন করিলেই বয়স কমিয়া ৪০ হইবে। বুঝিলেন না সুধী পাঠক? আপনি বুঝি নেটধন্য নহেন? নাকি নাতি নাতনির হাত ধরিয়া ইঁদুর দৌড়, অর্থাৎ কিনা মাউজের দৌড়ে নামেন নাই? দেওয়াল মানে ফেসবুকের ওয়াল, হাতের ছাপ হইল পোস্ট। আর এইচ বি ডি হইল হ্যাপি বার্থ ডে। আর অন্যটা? মেনি হ্যাপি রিটার্ন্স অফ দ্য ডে। প্রোফাইল পিক হইল ... যাক, আপনাকে আর বলিয়া কী হইবে। আপনি তো আর নিজের ছবি নিজের দেওয়ালে লটকাইয়া ধূপ ধুনা দিয়া পুজা করেন নাই। মিস্টার ফেকু, মিস ফেকুরা করেন।

পরদিবসেই ফেকুর জন্মদিন স্মৃতি একেবারেই গর্তে যায়। ডাস্টবিনে। মুহূর্তের ডাস্টবিন। সকলে ভুলিয়া যায়। দায়সারা ভালবাসা, মুসলমানের মুরগি পোষা।

২

আসলে ইহারা, অর্থাৎ ফেকুরা, এক নতুন প্রজাতির জীব। দেখিতে আমার আপনার মতই। ল্যাজ নাই, দুটা কান, দুটা চোখ, একটা ল্যাপটপ আছে। তবে, এক্ষণে বঙ্গভূষণ, বঙ্গবিভূষণ, বঙ্গ-অতিবিভূষণ যদি কেহই থাকিয়া থাকে তো সে ফেসবুক অর্থাৎ ফেবু নামক বিপুল বারিধিতে নৌকালীলা করা কলির কেষ্ট ফেকুগণ।

শুধু জন্মদিন কেন। সেলিব্রেশনের কিছু বাকি আছে নাকি? যদি পুজা পার্বণ মহোৎসব হয়, যদি বিজয়া রবীন্দ্রজয়ন্তী কি ঘনবরিষণ হয় তো সেলিব্রেশন করেন ফেকুগণ। ইহাদের হৃদয় ডাস্টবিনে সবার স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথ হইতে মন্দিরা বেদী। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার হইতে দীপা কর্মকার। কিছু হইলেই হইল, জন্মদিন মৃত্যুদিন পুরস্কার প্রাপ্তি দৌড় লম্ফন হারা জেতা। কোন না কোনভাবে হৃদয় ডাস্টবিনেরে পূর্ণ করিতে হইবে।

আর মধ্যে মধ্যে ডিলিট বাটন টিপিতে হইবে। সব ঘড় ঘড় ঘড়াৎ যাইবে কালের গর্ভে।

যদি আজ বৎসরের শেষদিন হয় তো কথাই নাই, খাদ্যমদ্যে ফেকুদের মহোৎসব। মহোত্তম হৈহৈবৃন্দের লম্ফঝম্প। হুতোম বলিয়াছিলেন বৎসরের শেষ দিনে যুবত্বকালের এক বৎসর গেল দেখিয়া যুবক যুবতীরা বিষণ্ণ হইলেন, ফেকুগণ দেখিলেন বড় মজা, সত্যকারের বয়স কাহাকেও দেখাইতে হয় না, ইহা ভার্চুয়াল জগত। এমনকি যাহারা কেক বিস্কুট খাদ্যমদ্যাদির কাঙাল, অকেশন পাইলেই পার্টি করেন কিন্তু পয়সা খরচে বড় গাত্রে ব্যথা, তাঁহারাও দিনটির বড়ই আদর করিলেন। কেননা আদতে ফেকু বলিয়া, আসলে ক্যাশবাক্সে হাত পড়িল না রাশি রাশি খাদ্যমদ্যের ফ্রি ডাউনলোড করিয়া পোস্ট করিতে লাগিলেন। কেহ জানিল না ট্যাঁকে কিছু নাই, বাড়িতে মুড়ি চিবাইয়া আছেন। নেট হইতে ভাল কেকটা, ভাল শ্যাম্পেনটা, আশটা ছবি হইয়া দেওয়ালে ঝুলিতে লাগিল।

এক্ষণে আমরা এজ অফ ইমেজেস এ আছি। ছবিসর্বস্ব জীবন। সেকালে বিছানার মাথার কাছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হেলানো অবস্থায় মা কালী, পিতৃদেব, পিতামহ ও অন্য অন্য ঠাকুরগণের চিত্র ঝুলিত, সবুজ ছ্যাঁতলাপড়া দেওয়ালের গায়ে আহা কী শোভা দেখিতাম। আপাতত আমাদিগের ফোনে, ট্যাবে, ল্যাপটপে সর্বত্র ছবি ঝুলিতেছে। কালীপূজার কালী, দুর্গাপূজার দুর্গা, ফ্যাশনসপ্তাহের ঠ্যাংবাহির করা মডেল, গরমের আইসক্রিম, শীতের বনভোজনের আলুরদম, বর্ষার জলভরা ডাবের খোলা ... সবই ছবি হইয়া ঝুলিতেছে।

আর আমরা ঝুলিতেছি, চীইঈইঈইঈজ। অর্থাৎ ছবি তুলিবার পোজ, হাসি মুখ, দন্তবিকশিত মুখব্যাদানে জীবনের তাবত দুঃখ বাতিল, যেইভাবে টাকা না থাকিলেও, চকচকে জামা পরিলে টাকার অভাব খানিক পুরে, সেইরূপ আনন্দ না থাকিলেও, চকচকে হাসিলে, সে হাসিমুখ ওয়ালে, ওয়ালপেপারে লাগাইলে মনের দুঃখ খানিক পুরে। খানিক ঢাকা থাকে। বাহিরে প্যান্টুলুন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তনের ন্যায় ফেকুগণের সব দুঃখ, সব বেদনা, সব দারিদ্র্য চাপা পড়িয়া যায় কেবল এই ছবির দৌলতে।

ছবির মধ্যে বড় ছবি সেলফি। সেলফি একক, তুলিতে হইলে একা একা মুখব্যাদান করিয়া হাসিবে বা মুখ ছুঁচলো করিয়া অদ্ভুত চুম্বনোম্মুখ করিবে। সেলফির বহুবচন গ্রুপফি। অনেকে মিলিয়ে এক হইবে, এবং হাত গদখালির পেত্নির ন্যায় বাড়াইয়া ছবি তুলিবে। মুখমণ্ডল সকল উদ্ভাসিত হইবে, গোলাপি চুণ পড়িবে আলোক উদ্ভাসের সহিত ফোনের নিজস্ব সেলফি মাস্টার অ্যাপ-এর কল্যাণে।

চকচকে যাহা কিছু তাহাই সোনা। বাকি সব ডিলিট বাটন। বাকি সব ডাস্টবিন।

সেলফি তুলিতে তুলিতে মানুষ রেলব্রিজে উঠিয়া ট্রেন চাপা পড়িল। গঙ্গার ধারের পাথরের উপর পা রাখিয়া পা পিছলাইয়া তাহাদের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। সেলফি তোলা তবু থামিল না।

ছবিতেও ফেকু পর্ব আছে। সত্য ছবি চাই না। মিথ্যা ছবি প্রয়োজন। গরমের ছুটিতে বেড়াইতে যাইতে রেস্তর অভাব? পকেট ঢু ঢু? তাহাতে কি? সার্চ করিয়া সুইজারল্যাণ্ডের চিত্র টাঙাও। গ্রীষ্মাবকাশের বদলে দৃশ্যাবকাশ রচিত হইল। মদ খাইবার টাকা নাই, মকটেল নামক ঝুঠা সবুজ রঙ পানীয় লম্বা গেলাসে লইয়া পোজ দিয়া ভাব করিতেছ, পৃথিবীর সবচাইতে মাতাল তুমি ও তোমার বয়ফ্রেণ্ড? তা বটে, আজিকালি মদালসা নারীর চাহিতে মজালসা নারী অধিক লাইক প্রাপ্তা হয়।

ফেকুগণ কথায় কথায় রাশি রাশি আমোদ করে, রাশি রাশি লাইকপ্রাপ্ত হইয়া দেখায় ঃ দ্যাখো আমি কত ভাল দেখতে। দ্যাখো আমি কী অপূর্ব শাড়ি কিনিয়াছি। দ্যাখো আমি কত ভাল সাজিতে পারি। দ্যাখো আমি কত সুন্দর পোজ দিতে পারি। 'দ্যাখো আমি'-র কোন শেষ নাই। দ্যাখো আমি কী চমৎকার ফোটো তুলিতে পারি। আমার তোলা ফোটোই না দেখিতেছ! দ্যাখো আমি কী ভাল রাঁধিতে পারি। এই তোমাদের পোলাও রাঁধিয়া ছবি ট্যাগ দিলাম। দ্যাখো আমি কত ভাল ঘর সাজাই। দ্যাখো আমার বইয়ের তাকে কত দেশ বিদেশের বই, আমি কত বিদ্বান। দ্যাখো আমি দ্যাখো আমি দ্যাখো আমি।

হায়! কি দিনকাল পড়িল। ফেকুতে ফেকুতে ফেবু ছাইয়া গেল। ফেক আইডেন্টিটি, ফেক নাম, ফেক প্রোফাইল, ফেক ছবি। সব ফেক জানিতাম, এমনকি কলিযুগে ভালবাসা, প্রেম স্নেহ মমতা বন্ধুত্ব। কথার কথা বলিয়া দেশ উজাড় হইয়াছে ফেকু আবেগে। তাও সহিতাম। শেষে দেখি, আর এক নতুন ফেকের ভেক। লেখক হইয়াছেন সব।

কাগজ নাই কলম নাই, শুধু মাউজ হাতে লইয়াই লেখক। টাকা চাইনা, কেবল ইন্টারনেট চাই। কীবোর্ড খুটখুটাইয়া লেখক বনিয়া যাইতেছে সদ্যোজাত বালকবালিকাগণ ... বৃদ্ধ-প্রৌঢ়েরাও কম যায় না। সকল ফেকুগণ মহা মাতব্বর। লিখিলেই সারি সারি লাইক, বুড়া আঙুল উঁচাইয়া। আর ওয়াহ্, অসাম, দারুণ, অসাধারণ, কী সুন্দর, আহা ...। কমেন্টের বন্যা। ঝোপ বুঝিয়া কেবল কোপ মারনের অপেক্ষা। তক্কে তক্কে থাকিয়া মধ্যরাত্রে নোট পয়দা করিয়াছে। সকাল হইতা বার বার দেখিতেছে, কয়টা বুড়া আঙুল পড়িল। আহা, কী হাততালির আওয়াজ। সারি সারি অদৃশ্য সিটে ভর্তি জনতা ... শ্রোতা ও দর্শক। অলীক, ভার্চুয়াল। তাহারা তালি মারিতেছে আর কবি লেখা পয়দা করিতেছে। পয়সা লাগে না। না লিখিতে, না তালি মারিতে। যদি প্রতি লেখা পোস্ট করিতে দু টাকা, আর প্রতি লাইক দিতে কুড়ি পয়সা ফাইন হইত তবে বুঝিতাম কত ধানে কত চাল! ফেকুদের রাজনৈতিক চেতনার কথা আর কী বলিব, তাহাও অতি উন্নত। কে কী খাইল, কে কী রাঁধিল ইহা যেমন তাহাদের মনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে, তেমনই, কোন রাজা, কোন রাজপুত্র চুরি করিল, কে মিথ্যা কথা বলিল, কোন নেত্রী কটা জুতা আলমারিতে আর কটা কঙ্কাল কাবার্ডে রাখিলেন তাহাও একে অপরের দেওয়াল হইতে শেয়ার করিয়া বসে আর মনে মনে বাহবা দেয়, আমি বড় প্রতিবাদী হইলাম, দ্যাখো সকলের জারিজুরি ফাঁক করিয়াছি।

সেদিন এক ফেকু দেখিলাম বড় বড় করিয়া লিখিয়াছেন, সব ব্যাটা চোর, সব ব্যাটা পকেটমার। সঙ্গে ডাউনলোড করা

ছবি, কোন বিখ্যাত পত্রিকার নিউজ, চুরি হইয়াছে রাজকোষে। বুঝিলাম, প্রতিবাদ বড় বিষম বস্তু।

পরদিবসে দেখিলাম, মিশর বাংলাদেশের স্কোয়ারে স্কোয়ারে যত প্রতিবাদী সভা তাহার ছবি টাঙাইয়া প্রতিবাদ দেখানোর তুষ্টি পাইয়াছেন ফেকু রা। ইহাদের একবার যদি অগণতান্ত্রিক উপায়ে হাজতবাস করানো যাইত, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নামে হুংকার ছাড়া বন্ধ করা যাইত।

ফেবুর আর এক ফেকু হইল কথায় কথায় কংগো, কংগো, কনগ্রাচুলেশনের বন্যা। কুড়ি বৎসর পূর্বের বিবাহের ছবি পোস্টাইলেন, এই জমানায় কঙ্গো পড়িল বিস্তর। কেহ পুরস্কার পাইয়াছিলেন মান্ধাতার আমলে, ছবি সাঁটাইলেন, কঙ্গো পড়িল ... হায়, কনগ্রাচুলেশনের মাথা নাই, ল্যাজা নাই।

তবে ফেসবুকের আমোদ শীঘ্র ফুরায়, অভিনন্দনের অকেশনও পরদিবসে বাসি পচা গলা ও ধসা হইয়া যায়, ক্রমে একই পোস্ট তেতো হইয়া পড়ে, টাটকা অকেশন টাটকা-টাটকা থাকাই ভাল।

নিচে দিলাম কয়েক ফেকুর কার্যকলাপের বিবরণ, পড়িয়া পাঠক হও অবধান, সাবধান।

এক ফেকু মহাশয় প্রথমে বড় মানুষের বাড়ির রবিবারের আড্ডায় স্রেফ হাজিরা দিতেন, বড় বড় পণ্ডিতগণ সেখানে কথা বলিতেন, ফেকুবাবু শুধু হাঁ-টা হুঁ-টা দিতেন। বা, মুখে কিছু না বলিয়া, কেবলি ঘন ঘন মাথা নাড়িতেন। সেখানে পাত না পাইয়া এখন আর বাড়ি হইতে বাহিরান না। অনেক সহজ হইল, বাস ভাড়া নাই, পাটভাঙা জামাটি পরিবার কসরত নাই, হাঁটিয়া স্টপ হইতে বড়মানুষ দাদার বাড়ি যাওয়ার ঝামেলা নাই। বাড়ি বহিয়া গিয়া দুইচারিটা গালাগাল খাওয়া নাই। এখন ফেবুতে ঢুকিয়া মহাশয় সকাল সকাল বসিয়া পড়েন। আড্ডা মারেন, চ্যাটান। আর সাহিত্য গ্রুপ ভিজিট দ্যান।

আপাতত নানা গ্রুপে হাজিরা দিবার ফলে, বিশেষ কিছু কিছু অন্য অন্য ফেকুগণের লেখায় লাইক দিবার ফলে, আর অন্য গ্রুপের কারো কারো পোস্টে আগু বাড়াইয়া গালি দিয়া, সমালোচনার নামে ঝগড়া করিয়া আসিবার ফলে, গ্রুপ মডারেটরগণের সূক্ষ্ম বিবেচনায়, জনৈক ফেকু সম্পাদকের সুপারিসে ও জনৈক বড়দার কৃপায় নিজেই পণ্ডিত হইয়া পড়েন। এখন নিজে তিনি গল্প, কবিতা ও মুক্তগদ্য লিখিয়া পোস্ট দেন যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক লাইক পান, ছিপ ফেলিয়া সকাল হইতে ফেবুতেই বসিয়া থাকেন। কসরতের মধ্যে শুধু মাঝে মাঝে উঠিয়া গিয়া বইয়ের তাক হইতে এক আধখান কোটেশনের বই নামানো আর ঝাড়িয়া দেওয়া। ঐটুকু না করিলে ভয় আছে। শুনিয়াছেন কোন এক বাবু সারাদিন কম্পিউটারের সম্মুখে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া শেষ অবধি মহাপুরুষের ন্যায় হইয়া গিয়াচেন। ধ্যানস্থ হয়ে ফেসবুক করেন, গায়ে বড় বড় অশোত্থগাছ ও উইয়ের ঢিপি হয়ে গিয়েছে।

এক একজন ছিলেন, রোজ সকালে বঙ্গভাষার ব্যাকরণের গুষ্টির তুষ্টি করিয়া কবিতায় স্ট্যাটাস দিতেন। সবাই বাহা বাহা করিতে। একদিন খেয়াল করিলেন, স্ট্যাটাস তো দিনগত পাপক্ষয়ের ন্যায় ক্ষয় পাইয়া যায়। ফেবু-র স্ট্যাটাস দুইদিনেই বাসি। দীর্ঘ আয়ু লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। সময়ের ডাস্টবিনে যতই ঢাল, সবই ত লয়প্রাপ্ত হইবে।

তাই, সব ফেকু মিলিয়া বুদ্ধি বাহির করিলেন। সব ফেকু ঠিক করিলেন, তাঁহাদের সব স্ট্যাটাস একত্র করিয়া বই করিবেন, এই মানসে "স্ট্যাটাস-সমগ্র" বাহির করিবেন ভাবিতেছেন। ইহাই তাঁহার জীবনের হাই পয়েন্ট হইবে।

বিল গেটস সায়েবের কথা অমৃতসমান, তিনি নাকি বলিয়াছেন শুনিলাম, এই বিশ্বগ্রামের কেন্দ্রীয় প্লাজা ইন্টারনেট। আমি বলি, ফেকুদের রাজত্বে বিশ্বগ্রামের চণ্ডীমন্ডপ হইল ফেবু, অর্থাৎ ফেসবুক। চণ্ডীমন্ডপে সারা পাড়ার কেচ্ছা ঘাঁটিয়া আসিয়া বসিলাম, দুদণ্ড জুড়াইলাম, গায়ের ঝাল ঝাড়িয়া গালি দিলাম বড় বড় মানুষকে, নিজের কবিতা আউড়াইলাম, তাহার পর বাড়ি গিয়া ঘুমাইলাম। আহা! বড় সুখ, বড় আনন্দ।

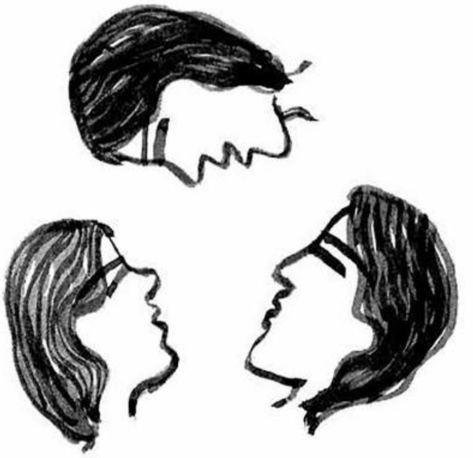

সব ডাস্টবিন হয়ে যাক

সুকান্তি দত্ত

অফিস টাইমের ভিড়ঠাসা ট্রেনের কামরা, ঘেঁষাঘেঁষি-ঠেলাঠেলি-চাপাচাপি-ঘষাঘষি। নানা বয়েসের ছেলে-বুড়ো, মহিলাও আছে কয়েকজন, এরই মধ্যে একটা মোবাইল ঘিরে গোল হয়ে আছে কয়েকজন যুবক ও আধবুড়ো। জিভে কেউ কেউ নানা বিচিত্র শব্দ করছে। নীলছবি চলছে। একজন আরেকজনকে ব্লুটুথে মালটা সেন্ড করতে বলছে।

যত জঞ্জাল তত ডাস্টবিন নেই। জঞ্জাল-আবর্জনায় ভরে যাচ্ছে চারপাশ। প্রায়ই মনে হয় হেঁটে যাচ্ছি আবর্জনার ঘেরা দিয়ে নিজেও আবর্জনা ছড়াতে ছড়াতে।

অভিজাতদের দিন শেষ! ভদ্রলোকরা ক্রমশই বিরল প্রজাতি। বুদ্ধিজীবীরা অবশ্য এর নানারকম গুরুগম্ভীর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা দিচ্ছেন, কিন্তু আমি অতশত বুঝি না, শুধু দেখছি জঞ্জালে ভরে উঠছে চারদিক। এত জঞ্জাল এত জঞ্জাল যে কোথাও আর আলাদা করে ডাস্টবিন পাওয়া যাচ্ছে না।

যা কিছু ভদ্র-সভ্য বলে জানা ছিল সব নাকি মধ্যবিত্ত ভণ্ডামি-ন্যাকামি। এজন্য রবি ঠাকুরের আর কিছু জানুক না-জানুক ওর যে খুব মহিলাঘটিত দোষ ছিল সেটা সকলেই জেনে গেছে। সে-সব নিয়ে বই লেখা হচ্ছে, হু হু করে বিক্রি, এত এত বিক্রি প্রকাশক দাঁতমাজা- হাগামোতা-খাওয়া ঘুমের সময় পাচ্ছে না।

দেশনেতারা—বড় নেতা—ছোট নেতা-হাফ নেতা-ফুল নেতা জনসভায় বা কর্মীসভায় বা সাংবাদিকদের সামনে চমৎকার ভাষায় কথা বলছেন, ঘরে ছেলে ঢুকিয়ে দেব রেপ করে চলে যাবে কিংবা পুলিশকে বোম মারুন কিংবা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে লাইফ হেইল করে দেব ইত্যাদি ইত্যাদি। হাততালিও পড়ছে প্রচুর।

কলেজ পড়ুয়াদের একাংশ আগেও মদগাঁজা খেত, তবু একটু আড়াল-আবডাল ছিল, এখন ওসবের বালাই নেই, বিশেষ কোনও দিনও লাগে না। বরং বিশেষ বিশেষ দিনে, পঁচিশে ডিসেম্বর কি একত্রিশে ডিসেম্বর, কালীপুজো, দুর্গাপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, বিশ্বকর্মা পুজো ইত্যাদি ইত্যাদি দিনে চেনা এলাকাতেও স্কুল কলেজ পড়ুয়াদের প্রকাশ্যে রাস্তায় মদ্যপানের ধুম দেখে গা ছমছম করে। নিজের পেটে দু-পেগ থাকলেও নেশা উড়ে যায়। আর সঙ্গে কোনও মহিলা থাকলে তো রীতিমতো বুক ধুকপুক করে।

আগে ছিল হাড়কাটা গলি, সোনাগাছি, কালীঘাট—এখন পাড়ায় পাড়ায় ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে মধুচক্র। কষ্ট করে কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। নেটে গিয়ে সার্চ করে ছবি পছন্দ করে ফোনে বাড়িতে ডেকে নিলেই হল—ভরপুর মস্তি। মুক্ত বাজারে মুক্ত যৌনতা।

খেলার মাঠ থেকে পুকুর ডোবা সব ঢেকে যাচ্ছে কংক্রিটের আবর্জনায়। প্রমোটারদের লালসা থেকে এমন কি স্কুলবাড়িও বাদ যাচ্ছে না। বাড়ি দখল করতে বৃদ্ধা মাকে পেটাতে পেটাতে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে ছেলেবৌমা। নদীনালা খালবিলে জলের রং কালো, হাওয়ায় ভাসছে পচাগন্ধ, থিকথিক করছে পোকামাকড়। বাড়ছে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া, সব ডাস্টবিন হয়ে যাচ্ছে।

গঙ্গার পাড়ে মাঝে মাঝে যাই। বাবুঘাট-চাঁদপাল ঘাট থেকে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলি প্রিন্সেপঘাটের দিকে। ভালো লাগে, সুন্দর সাজানো গোছানো পার্ক। গাছপালা, যত্নে ছাঁটা ঘাস, সুদৃশ্য রেলিং, সিমেন্ট বাঁধানো কাঠের চেয়ার। কিন্তু ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলে চারপাশে আর তাকানো যায় না। কত রকমের আবর্জনা। আর জলের রং? সেও কেমন ঘোলা ঘোলা, তাই আর জলে হাত-পা ডুবিয়ে মা গঙ্গার আশীর্বাদ নেওয়া হয় না।

সেদিন সবে সন্ধে নেমেছে। ত্রিফলা আলোয় মায়াবী হয়ে উঠেছে গঙ্গাপাড়ের পার্ক, গুনগুন করে গাইছিলাম—

বিস্তীর্ণ দুপারের অসংখ্য মানুষের

হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে

ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছ কেন?

কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, বইছি কোথায়? মরে গেছি তো!

চমকে ঘুরে তাকালাম, না কেউ না! এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম একটু দূরে গাছের নীচে সিমেন্টের বেদিতে আধশোয়া হয়ে আছে এক নারী। কী মনে হল, এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম এক বৃদ্ধা, ময়লা সাদা শাড়ি, কুঁচকে যাওয়া চামড়ায় কাদার ছোপ, চোখ বোজা, ঠোঁট অল্প ফাঁক হয়ে আছে। অসুস্থ কী? কী করব? চলে যাব নাকি লোকজন ডেকে— এসব ভাবতে ভাবতেই উনি চোখ খুললেন, আমি একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে শুয়ে কেন? শরীর খারাপ? থাকেন কোথায়?

হঠাৎ দমকা হাওয়া ছুটে এল, সঙ্গে ধুলো, হাত দিয়ে চোখ-নাক-মুখ আড়াল করে একটু সুস্থির হয়ে ফের তাকাতেই দেখলাম, সেই বৃদ্ধা হেঁটে চলেছেন, পার্কের রেলিঙের উপর উঠলেন, তারপর সোজা ঝাঁপ মারলেন, আর পাখি হয়ে উড়তে উড়তে গঙ্গার বুকে মিলিয়ে গেলেন।

গঙ্গা—এদেশের সবচেয়ে বড় ডাস্টবিন। যেখানে প্রতিদিন মিশছে কলকারখানার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, জীবজন্তুর পচাগলা মৃতদেহ, অসংখ্য নদী-খাল-বিল থেকে বয়ে আসা আবর্জনা, মানুষ সহ নানা জীবজন্তুর মলমূত্র, আরও কত কী!

কাজী নজরুল লিখেছিলেন— ভাগীরথীর ধারার মতো সুধার সাগর পড়ুক মরে—সে সুধার সাগর এখন বিষের সাগর! গঙ্গাও আজ এত আবর্জনা বইতে পারছে না! আবর্জনা আর ডাস্টবিন একাকার হয়ে যাচ্ছে!

সব ডাস্টবিন হয়ে যাচ্ছে! সব ডাস্টবিন হয়ে যাচ্ছে!

আমিই সেই

তন্বী হালদার

হারগিলে সরু সরু শিরা উপশিরার মতো গলিঘুঁজি বেয়ে বেয়ে ধেয়ে আসছে অদ্ভুত এক গন্ধ। গন্ধটা অনেকদিন, না না আমার জন্ম থেকে এযাবৎ আমাকে তাড়া করে ফেরে। আমি জানি এই গন্ধটা কিসের। গন্ধটা তিনদিনের জলে ডোবা মানুষ পচার গন্ধ। অবশ্য তার আগে অনেক রকম গন্ধের সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছি। ভাদ্রের প্যাচপ্যাচে গরমে ঝিম মেরে থাকা যাবতীয় অশুচিময়তা আমাকে ঘিরে থাকে সবসময়। আমার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে পথচারী থুতু ফেলে। লিপস্টিক বাঁচিয়ে মুখে রুমাল চাপা দেয় ফেসবুকের মহিলা কবি। পুরুষ কবি তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যবান / স্বাস্থ্যবতী রজনীগন্ধার ডাঁটা ডাউনলোড করে মহিলা কবির নাকের গর্তের সামনে ধরে। বেশ লাগে। সম্প্রতি কি এক পরিষ্কার অভিযানে গদ্যকারদের ডাকা হয়েছিল। বলা হয়েছিল "কিছু লেখো তো বাপু"। তা সেখানে তো এখন সিন্ডিকেট রাজ। তাদের আমার গন্ধে উল্টি আসে না। তারা তাড়িয়ে তাড়িয়ে আমার ভেতরকার এক পৃথিবী যন্ত্রণার জঞ্জাল নিয়ে গদ্য মারায়। কোনোসময়ে কখনও কোনো দুর্বল মুহূর্তে আমি কি কোনো গদ্যশিল্পীকে বলেছিলাম, 'জানেন আমি জন্ম থেকেই বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো পাবলিক। আমার কোনো অতীত নেই, ছ্যা ছ্যা করা বর্তমান, আর ভবিষ্যতের গর্ভে সেই ক্লকওয়াইজ ঘুরে ফিরে নৃত্য করে 'তিন দিনের বাসি পচা লাশের গন্ধ'। আমার ভেতর সবসময় উ উ করে গুঞ্জন করে এক ঝাঁক ডাঁশ গুয়েমাছি। একবার একটা বাচ্চা মেয়ে মায়ের হাত ধরে আমার পাশ দিয়ে স্কুলে যাচ্ছিল। তার মা মেয়ের মুখে চেপে রেখেছিল সুগন্ধী রুমাল। তবু বাচ্চামেয়েটা সেই রুমাল সরিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মা ওর ভেতরে উ উ করে কে কাঁদছে?'

সামনে পড়ে আছে যে ডাঁই করে রাখা অযুত অন্ধকার তার মধ্যে মশার লার্ভার মতো কিলবিল করছে মানুষের ভ্রূণ। সামনে অতর্কিতে উঁকি দেয় ছেঁড়া পোস্টার। লেখা আছে 'কন্যা ভ্রূণ হত্যা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ'। আমার চোখের পাতা নেই। মাছের মতো আমি তাই জেগে আছি আদি, অনাদি কাল ধরে। আমার চোখের সামনে প্রতিদিন হাঁসের ডিমের রঙের সূর্যটা ওঠে, তারা ভরা রাত, সাদা জ্যোৎস্নার রাত সব পার হয়। আমার শরীরের ভুলভুলাইয়ায় দাবী রেখে যায় ভীতু কবি আবার কখনও সিন্ডিকেট গদ্যকার। আমি নির্বিকার। কারণ আমি জানি আমি কে? আমি, আমি। আমি সে। হ্যাঁ আমিই সে। আমি কখনও তুমি নই। তুই না। না আপনিও না। আমি একমাত্র সে। তাই আমার ভেতরে অনায়াসে ফেলে দিয়ে যায় সদ্যজাত অবাঞ্ছিত শিশুকন্যা। তাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে তিনটে কুকুর। আচমকা তিন দিনের জলে ডোবা বাসি লাশের গন্ধে উস্কে দিয়ে যায় 'সে আমাকে ছেড়ে যায়নি এখনও .....'।

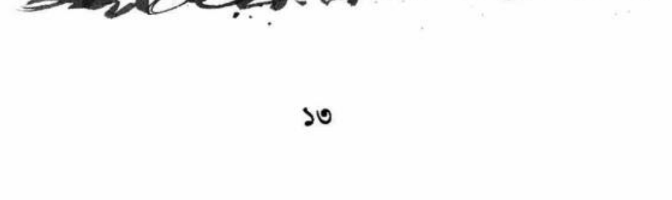

সম্পর্কের ডাস্টবিন

স্বাতী গুপ্ত

সভ্যতার ক্রম বিবর্তনে নাগরিক সভ্যতা, ক্রমাগত জটিল থেকে জটিলতর জীবন। দ্রুততার সাথে প্রকৃতির সাথে বাড়ছে দূরত্ব। প্রকৃতির পরিবর্তন মন্থর। এই পরিবর্তন দ্রুতগামী। ধূসর চাদরে ক্রমশ আচ্ছন্ন হচ্ছে মানবিক প্রবৃত্তি। নেট নির্ভর আধুনিক যুগ এখানে মানুষের সৃষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো অবক্ষয়ের সম্মুখীন। সামাজিক তথা পারিবারিক সম্পর্কের অবমূল্যায়ন তীব্রভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রায়শই টেলিভিশন এবং সংবাদ পত্রে শিরোণাম অনুভূতিকে আলোড়িত করে। প্রশ্ন জাগে মনে এ কোন আধুনিকতার পথে মানব সভ্যতা। এখানে কৃত্রিম যন্ত্রের নির্ভরতা মানুষের চেয়ে বেশি কাম্য। সম্পর্কের চৌহদ্দি কমে এসেছে, যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের ক্ষুদ্র বৃত্ত; জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের রাঙতা মোড়া নিজস্ব জগৎ। তবুও এই স্বল্প পরিসরে মনের ফাঁকটা বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে।

সভ্যতার যতো আবর্জনা যা কিছু দূষিত অশোভন বাড়তি তাকে বহন আর ধারণ করার দায়ভার নিঃশব্দে বহন করে চলেছে ডাস্টবিন। অপরিহার্য্য এই ডাস্টবিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য্য, অনায়াসে জঞ্জাল ছুড়ে ফেলে স্বচ্ছ সুন্দর পরিবেশ। জন্মের সময় মানুষের মন থাকে অলিখিত সাদা কাগজ, সদ্যজাত শিশুর চোখের দৃষ্টিতে কোন ভাব প্রকাশ পায় না। সেই নিষ্পাপ দৃষ্টি ক্রমশ বিভিন্ন ভাবের প্রকাশে জটিল হয়ে ওঠে। মানুষের মন এক বর্ণময় আখ্যান। বর্তমানের ব্যস্ত জীবনযাত্রা, সম্পর্কের সীমাবদ্ধকরণ, নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির স্বল্প পরিসর অথচ মনের ক্লেদ জমে উঠে মানসিক রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পরিসংখ্যান বলছে এখন জটিল মনোরোগীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। "Mental health is not a static condition but subject to variations and fluctuation of degree, influenced by both biological and social factors". ক্রমাগত বেড়ে ওঠা কাউনসিলিং সেন্টার এবং স্বাস্থ্য বিভাগের Mental Health Clinic-এ ক্রমবর্ধমান রোগীর সংখ্যা দেখলে সহজেই বোধগম্য হয় মানুষের মন আজ অনেক বেশি অসুস্থ।

সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটা ডাস্টবিন দরকার, যেখানে সমস্ত মনের অলিগলিতে জমে ওঠা ক্লেদ আর ভুলগুলো অনায়াসে বলা যায়। আর সেই ডাস্টবিনের বিশ্বাসযোগ্যতা আর ধারণ ক্ষমতায় এক নিষ্কলুষ সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্ভব হয়। খ্রিশ্চানদের 'কনফেশন'-এর ব্যবস্থাটি এক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী মনে হয়। পাপ কতটা স্খলন হয় এতে নাই বা জানলাম কিন্তু মানসিক চাপমুক্তি নিঃসন্দেহে ঘটে। ঠিক ভুলেই মানুষ, তার ভুল আর অবদমিত ইচ্ছেগুলো যে কোন সম্পর্কের আধারে নির্ভয়ে স্থাপন করতে পারলেই মানসিক স্বাস্থ্য সুন্দর হয়ে উঠবে এতে অনেকটাই হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ ফিরে এসে সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে।

সম্পর্কের এই আধার যে কেউ হতেই পারে বাবা-মা শিশুর বন্ধু হয়ে উঠতে পারে। আর এক্ষেত্রে বার বার মনে পড়ে যৌথ পরিবারের কিছু বাড়তি সম্পর্কের কথা, সেখানে এমন কিছু সম্পর্ক থাকতো যা হয়ত নিজস্ব বৃত্তের কেন্দ্র থেকে অনেকটাই দূরে অবস্থিত ছিল কিন্তু কিছু মনের খুব কাছে ছিল তাদের অবস্থান। অন্ধ মনের বন্ধগলিতে জমে থাকা স্তুপিকৃত আবর্জনা যেই আধারে অনায়াসে নির্ভয়ে ছুঁড়ে ফেলা যেত। সাহিত্যের সাথে বারে বারে এমন চরিত্রগুলো আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে। এজমালি উঠানের চারিদিক ঘিরে অনেক ঘরের বাসিন্দাদের নিত্যদিনের খুঁটিনাটি চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দের সাথে পরিচিত উঠানটাই ক্লান্ত অবসরে সাক্ষী হয়ে উঠতো এমনই সম্পর্কের আধারে যন্ত্রণা আর ঠিক ভুলের স্থাপনের। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আশ্রয় আর স্নেহের প্রশ্রয়ে অবলীলায় বিকশিত হতো শিশুমন।

অবলুপ্ত সেই সম্পর্ক আজ; প্রতিটি মনের একটা সম্পর্কের ডাস্টবিন আবশ্যক, বলিষ্ঠ যার ধারণ ক্ষমতা।।

(রম্যরচনা) ডাস্টবিন

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

রোজ ভোরবেলায় প্রাতঃভ্রমণের নির্মল আনন্দ নিয়ে মনের খুশিতে বাড়ীর বাইরে পা রাখেন শহুরে মাঝবয়সীরা। তারপরেই লেকের মাঠে পাতা বেঞ্চিতে বসে শুরু হয় তাদের প্রাতঃকালীন আড্ডা।

'ক' বাবু— মনে পড়ে রবিঠাকুরের সেই গানখানি? যেখানে শাস্তা বলে ওঠে 'নির্মল হোক হোক সব জঞ্জাল' তার উত্তরে মায়াকুমারী বলছে "দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম ..." আরে মশাই! নির্মল হোক বললেই সাফসুতরো হওয়া যায় বুঝি? স্বচ্ছ ভারত গড়ব, ঝাঁটা অভিযান চালাব ... এ কি মুখের কথা ভায়া? এত্তা বড়া দেশ মে ইতনা জঞ্জাল। ডাস্টবিন আছে মোড়ে মোড়ে। ভ্যাট আছে পাড়ায় পাড়ায়। তবুও ধূলিতলে যাব রাখি স্যানিটারি ন্যাপকিন হইতে ডায়াপার, কন্ডোম হইতে প্লাস্টিক। জঞ্জাল ফেলা আমার জন্মগত অধিকার। মডার্ণ কুকুর, বেড়ালেরা এখন অনেক উন্নত মস্তিষ্কের। ওরাও জানে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়নি বলে এইদেশটা পিছিয়ে পড়েছে তাই ওরা কিন্তু এযুগে মুখ ডুবিয়ে একসাথে খায় পাতপেড়ে।

'খ' বাবু— কবে ফিরে যাব আপন দেশে, ঘুচিবে ভবের জঞ্জাল ... এই বিখ্যাত বাউলগানের হাত ধরে বলি এমন একটা ডাস্টবিন খুঁজে পেলাম না, যার চারটে মুখ থাকবে। একটিতে ফেলা হবে অশুচি, একটায় শুচি। একটায় মানুষের ক্লেদ, গ্লানি আর বাকীটায় সত্যি জঞ্জাল।

'ক' বাবু— ভাল বলেছ ভায়া। এমন ডাস্টবিন হলে কিন্তু ব্যাপক হত। বিদেশের মত, কোনও খোপে মেটাল, কোনটায় কাঁচ, কোনটায় প্লাস্টিক, কোনও খোপে মাছ!

'খ' বাবু— আরে রীতিমত পদ্য যে দাদা। এ অভ্যেস ও আছে নাকি?

'ক' বাবু— থামান তো মস্করা।

'গ' বাবু— কেন বাপু? দিল্লিকে ঝাপসা দেখেই রাতের ঘুম গেল বুঝি কলকাতাবাসীর? জানোনা? উল্টে গেছে প্রবাদ, পাল্টে দ্যাখো। ভাল কিছু বাংলা আগে ভাবে, পরে ভাবে বাকীরা। আর খারাপ কিছু মানে ঐ দূষণ ফুষণ আগে ভাবে বাকীরা তারপর আমরা।

'খ' বাবু— আরে মশাই সারা দেশ এখন বিশ্বায়নের কাছে নতজানু। প্রোমোটার রাজের দৌলতে ফ্ল্যাট, ই-এম-আই এর সুবিধায় গাড়ি আর সেই সঙ্গে অটো। শহর বলছে দ্যাখো আমি বাড়ছি মাম্মি। মাম্মি বলছে আর পারছি না। না পারলে চলবে? তুমি সর্বংসহা ধরিত্রীর জাত। পারতে তোমাকে হবেই।

'ক' বাবু— আর যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু? তাহাদের কি টনক নড়িবেনা?

'গ' বাবু— নড়বেনাই তো। এই এত আলো, এত আকাশ, বাতাস, এই পথঘাট, এই গাছপালা সব তাদের নিজস্ব সম্পত্তি। বাতাসের দুষণ, পথের জঞ্জাল বাড়তে থাকুক। ক্ষতি কি না হয় নোংরা হবে পথ জঞ্জালের কাব্য।

'খ' বাবু— এই সেদিন কথা হল প্রত্যেকের বহুতলে নীচে নীচে কম্পোস্টার বাধ্যতামুলক। সারাবাড়ির জঞ্জালকে কমপ্যাক্ট করে তারপর ডিসপোজাল হবে। সেখানে আমার বাড়ির গলদার মাথার খোলা, তোমার বাড়ির পাঁঠার নলি, অমুকের দুধের প্যাকেট, তমুকের ছেঁড়া মাদুর সব এক ধোলাইতে হাপিস! তারপর আর কোথায় কি!

'গ' বাবু— কাজের কাজ হয় না। আসার পথে রোজ মনে হয় শহরটা না একদিন ধাপার মাঠ হয়ে যায়। ডাস্টবিন থাকলে লোকে সেখানে জঞ্জাল ফেলছে না। বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে টিপ করে তার মধ্যে ফেলতে যাচ্ছে। ব্যাস! সবাই কি মশাই বাস্কেটবল প্লেয়ার? পড়বি তো পড় মানুষের মাথায়। সবাই নিজের ঘরটুকুনি সাফ রাখে, পথঘাট চুলোয় যাক। আর যারা রিলিজিয়াসলি এবং সিরিয়াসলি ডাস্টবিনে ফেলছে বুদ্ধিমান কুকুর-বেড়াল সেগুলোকে বাইরে এনে ফেলছে। থার্ড গ্রেডেড দেশের ফোর্থ গ্রেডেড মানুষের ফিফথ গ্রেডেড কুকুর বেড়াল। কত বলে এলুম কাউন্সিলরের বাড়ি বয়ে। উনি বললেন, কি করি বলুন তো? খুব চিন্তার বিষয়।

'ক' বাবু— আরে মশাই ডাস্টবিন কত কাজের জানো? এই তো সেদিন আমার পাশের ফ্ল্যাটের একজনের ইনকাম ট্যাক্স রেইড হল। ভদ্রলোক একটু আগেই জানতে পেরে গেছিলেন। তাই ফ্ল্যাটের নীচে রাখা বিশাল গার্বেজে ভ্যাটের মধ্যে উপুড় করে

এসেছিলেন ব্রিফকেস ভর্তি কালো টাকা। আবার সকলে চলে যাবার পর আবর্জনার স্তূপ থেকে সীতা উদ্ধারের মত টেনে হিঁচড়ে বের করে আনলেন বান্ডিলগুলো। কি কাণ্ড! তারপর থেকে উনি ডাস্টবিনকে রোজ সকালে পেন্নাম ঠুকে আপিস যান।

'খ' বাবু— কারো পোষমাস, কারো সর্বনাশ। ডাস্টবিনের আস্তাকুঁড় ওনার কাছে তো আশীর্বাদ দাদা।

'গ' বাবু— আমার শালাবাবু যে বাচ্চা মেয়েটিকে অ্যাডপ্ট করছে সে তো ঐ ডাস্টবিনের মধ্যেই ন্যাকড়া জড়ানো ছিল। জঞ্জাল ফেলতে গিয়ে ঘরে এনে তুলেছিল, সেই থেকে মানুষ করছে মেয়েটাকে। ওনার জীবনটাও তবে বদলে গেল বলুন ঐ ডাস্টবিনের দৌলতে।

'খ' বাবু— উনি মানে আপনার মাননীয় শালাবাবু কি স্বেচ্ছায় দত্তক নিলেন নাকি পথের গু ফেলবি তো ফ্যাল নয়ত গন্ধে মর টাইপ অবস্থায় পড়ে ...

'ক' বাবু— কেন দাদা? ভুলে গেলেন রাজকাপুরের সেই বিখ্যাত সিনেমা "একদিন রাত্রে"? সে যাত্রায় ডাস্টবিনের মধ্যে ঢুকে পড়ে পার পেয়েছিল সেই রাতে সেই লোকটা?

'গ' বাবু— ভুলেই গেছিলাম।

'ক' বাবু— এই তো মুশকিল! ভাল কাজ করলেও সমালোচনা হয়। তাই তো আমাদের নেতা মন্ত্রীরা দেখেও দ্যাখেন না, বুঝেও বোঝেন না।

আস্তাকুঁড়

প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

সকাল এসে ঢলে পড়ল অন্ধকারের গা-য়ে আর ঝলসে উঠল হাত,
লিকলিকে দুটো পা, চুলে ঢাকা মাথা, আগুন জ্বলা জিভ, আর
হাড়জিরজিরে পেটটা খাবি খাচ্ছে তো খাচ্ছেই ...
১১ নম্বর তার নাম, বাড়ি হয়তো মুসুদ্দি পাড়ায় ছিল কোনও দিন
তারপর ঝরে গেছে বকুলের ডাল, বুজে গেছে ওদিকের নীলচক্ষু দিঘি
যেখানে মায়ের সঙ্গে কলাইয়ের বাসন মাজা, পুঁচকে হাতের বাসন উপুড়, জল ঝরাতে
ঠন ঠন ঠন পুরিয়া কল্যাণ, চাঁদ বসেছে ওদিক দিয়ে পোড়া নিমের ডালে,
মেঘ কেঁদেছে হঠাৎ হঠাৎ গাছের ছায়ায়
ভয় দেখাচ্ছে হাওয়াগুলো ফুটো বাঁশে ঢুকে
সড়াৎ করে দৌড় লাগাচ্ছে আয়ান ঘোষের মাগ
টুকরো করা বাতিল ৫০০, ভাঙা বোতল, জংধরা কাঁচি, পলিথিনে মোড়া আধফোটা মাংসপিণ্ড
দুম করে গড়িয়ে গেল আকাশের গা-য় ......

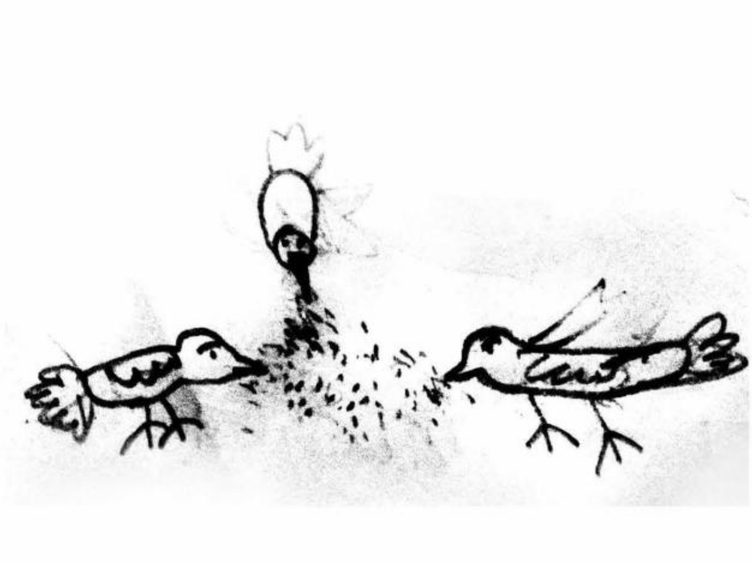

বাসব দাশগুপ্ত-র দুটি কবিতা

ডাস্টবিন-এক

গৃহস্থ মুছেছে মুখ অবশেষ নিয়ে গেছে জাল
তাচ্ছিল্য যা কিছু ছিল সবটুকু দৃষ্টির আড়াল

এভাবেই শুদ্ধ হই পাপ-তাপ ঢেলেদি অপর
ঝরাপাতা, উচ্ছিষ্ট, পড়ে ফেলা পুরোনো খবর

অক্লান্ত সঞ্চয় করে বিষগ্রীবা সংকোচে দাঁড়ায়
খোলস ত্যাগের পর ইতিহাস বাক্য হারায়

সবটুকু ধরে আছে ঢাকা দেওয়া নৌকোর ছই
যে নামে ডাকুক লোকে আসলেই ইতিহাস বই

ডাস্টবিন-দুই

ব্যবহার পর্বের শেষে বহুকিছু পরে থাকে
জমা হয়, জমে জমে করুণ আকৃতি
ক্লেদ নয়, বর্জ্য নয়, স্মৃতি

ঘটনা ঘটবার পরে কিছু থেকে যায়
অবশেষ ঢেউ তোলে, পরে থাকে বিষণ্ণ প্রকৃতি
নষ্ট নয়, ফেলনা নয়, স্মৃতি

পোষা ডাস্টবিন

সুমনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

কাক যদি কার্নিশে ভেজে
ক্ষতি নাই
কেউ তাকে পোষেনি কখনো
শুধু পোষা ডাস্টবিনে
তারা জমায়েত হবে
ছোঁ মেরে তুলে নেবে
দুরত্বের আঁশটে ঘ্রাণ
সরলরেখার ওপার থেকে
দেখে নেবো চোখে
কতটা সাজানো আছে
শহুরে বাগান

কাক যদি কার্নিশে ভেজে
ক্ষতি নাই
জমকালো দিনগুলো থাক
অশুভ ডানায় কোন জ্যোতি নাই ...

সুদীপ দাস-এর দুটি কবিতা

দধিচির কথা

যাকে তুমি দধিচি ভাবছ দেখো সেও
জীবনের পাশা নিয়ে ব্যস্ত, তার হাড়ে
বাতের সঙ্গেই যেন জমছে আমোদ

বজ্রের সন্ধানে মুখোমুখি দুইদল সেনা
একটি পুকুরে শুধু ময়লা ফেলছে প্রাণপণ
ডাস্টবিন থেকে যদি গড়ে ওঠে কোনও ফ্ল্যাটবাড়ি
কিছু কিছু খুঁদকুড়ো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়ে যাবে
সুযোগের ভিক্ষাপাত্রে, দূর থেকে দেখে
একালের দধিচিরা অবান্তর মেধার কৌটোয়
আলস্যের হাই তুলে ভাববে ভাববে
ময়লা ফেলার জন্য উর্বর স্থানই তবে ভালো

মাঝরাস্তা

আমার জন্মদিনের সন্ধেটা বরবাদ করেছে
জীবনবীমার একজন এজেন্ট

গোলকধাঁধার মাঝরাস্তায় জন্মাল আরও একটা শিশু
যার একরত্তি পা-দুটো এখনও পৃথিবীর মাটি ছোঁয়নি

খরখরে দাড়ি-ওঠা গালে কচি পা-দুটো
বুলিয়ে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি—
পাছে আমার শ্বাসের মধ্যে রয়ে যাওয়া ইতিহাসের
আমিষ গন্ধটা ওর নাকে যায়!

কিন্তু কতদিন!

একবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্য

বিজয় দাস

মহা-ভারতের মহাকাব্যেরা আশ্রিত,
শহরের আস্তাকুঁড়ে
রাবণদের ভিড়ে পদদলিত বানরসেনা
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সাময়িক উল্লাস
শিখণ্ডিনী, অপমান ভুলে ট্রাফিকের ভিখারি
অধর্মের ভিড়ে বক রূপী ধর্ম শীর্ণকায়
নিয়ন আলোর মোরামে সীতা অপহরণ
অবাধ।
পিতামহ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য্য, বিদুর-
এরা আজও নীরব
মহাকাব্যের পাতায় সর্বশ্রেষ্ঠ, বিদ্বান, শক্তিমান
আখ্যা প্রাপ্ত মহাপুরুষেরা এসমাজেও অন্ধ-বধির,
যে হোমকুণ্ড থেকে পাঞ্চালীর জন্ম
আজ মৃত্যুর কারণ।

কৌরব ভ্রাতৃ-বৃন্দের হাতে ধর্ম রাজ্য স্থাপনের গুরুদায়িত্ব
কুরুক্ষেত্র ধর্মযুদ্ধে ক্ষুধার্ত ভীমসেন মৃতপ্রায়,
অর্জুন ট্রেনের হকার, যুধিষ্ঠীর কেরানী,
আর নকুল-সহদেব বেশ্যা পাড়ার দালাল।
সমাজে উচ্চপ্রতিষ্ঠিত জমকালো ইন্দ্রলোক
দুর্যোধনের স্বর্গবাস,
উর্বশী, মেনকারা এখানেও বিলাসী নর্তকী।

মাঝে মধ্যে কৃষ্ণর দেখাও জোটে
পাড়ার মোড়ে
আগত রাধা, বিশাখা, রুক্মিনীদের
শিসদিয়ে সুর রচনা,
গৃহস্থ রাম, সংসার-বাজেটের চাপে
রাবণের বেতনভুক্ত চাকর,
শহরের আস্তাকুঁড়ে মহাকাব্যের নায়কেরা
জঞ্জাল ঠেলে ফুটপাথ,
রথের চাকার তলা অথবা রেললাইন,
অবশেষ ইলেকট্রিক চুল্লী।

জন্মান্তর

শোভন মন্ডল

জন্মের ভিতরেও ভোজবাজির আশ্চর্য বিভ্রম
গড়াতে গড়াতে তুমুল সংঘর্ষ
সবটাই কাল্পনিক নয়
কিছুটা সরাসরি সম্প্রচারিতও বটে,
আস্তিনে গোটানো তাসের মতো অলক্ষ্যে
প্রেত-রূপী জন্মের গোধূলি
ধুলোর মলাটে অজস্র পদচিহ্ন
অশরীরী, চলে যাওয়া
ফিরে আসা নতুন মোড়কে ...

ধূলি পাত্রের সাতকাহন

চয়ঞ্জীব শূর

হাজার বছর আগেও যে লড়াই হয়েছিল
মানুষের মধ্যে
তার বোধগম্যতা বর্জ্যতার সান্নিধ্যে এসে ইতিহাস হয়েছে
বজ্র বেগে আকাল ডেকেছে উথাল পাথাল আর
তার কেচ্ছা বৃষ্টি হয়ে ঝরেছে—

চাঁদের গায়ের কলঙ্কের মত
তা লেগে না থাকলে হয়ত পরিপূর্ণতা ছিল না জ্যোছনের
পৃথিবীর সব থেকে বড় সত্যি যদি হয় হ্যাঁ
তবে, মিথ্যেতেই থাকে বর্তমানের অস্তিত্ব
কুৎসার বিছানায়
তার দুকলম বটে ডাস্টবিনেই ফেলে দেওয়া যায়

তবে একটি অভিমানি বিকেল যতটা ছিল
প্রেমিকের হিংসেতে
তারা বেঁচে থাকে আস্তাকুঁড়ে
একটা কংক্রিটের সমুদ্রের মধ্যাবয়বে
স্বপ্নের সঙ্গে দুঃস্বপ্নের বিনামূল্যতায়
তাকি সত্যি ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া যায়?

সেই স্বপ্ন জমেছিল চোখের পাতায়
ভোরের অপেক্ষায়—
কোয়ান্টাতে দুঃস্বপ্ন দেখার মত,
সেই স্বপ্নজাত আশার প্রত্যাশারা
প্রাতঃকৃত্যের ফ্ল্যাশ হয়েছে

আমার গ্রহের ফেরে ঘটে যাওয়া অঘটনে
শনির দশারা তেলচিটে গালে
ব্রণর মত পুঁজে জমেছিল
উপগ্রহের যত কল্পনার পরিকল্পনা থাকতে পারে
তাকে ডাস্টবিনেই ফেলে দেওয়া যায়।

ট্রিপি-লাইটের সাইকোডেলিক মত্ত্বতারা
সূর্য ফোঁটায় প্রতিদিন রাতের অন্ধকারে
কত ডাইরির গর্ভজাত ভ্রূণ পড়ে থাকে ডাস্টবিনে
একটা স্বপ্ন দেখবে বলে হয়ত
তার জন্মই হল না আর।

সেই ধুলি পাত্রের ধুলি কণারা গোধূলির রামধনুতেই
পক্ষীরাজের পরিবার।

বর্ণমালা

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতি প্রাতে কার বীণা শুনি অপূর্ব সুর তালে
প্রতি রাতে স্বপ্ন দেখি তুমি কে নারী
ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরলে কেন
মৃত্যুর গন্ধ পাই আতঙ্কময় শিহরণে
বালুকাবেলায় বাঁধিনি তো ঘর ঝর উঠবে ঝর
প্রেমিকা নেই বলে কোনো আক্রোশ ধরে
রাখিনি তোমার ওপর কুহকতাময় চাঁদ
যেখানে থাকি ভোরের বীণার সুর
আমাকে ঝাঁপ দিতে বলে অজানায় অচেনায়
কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ে বুকের
মধ্যে হানা দেয় অকাল শীত
দুরন্ত যুবকের জ্যাকসন-জুতোর মতোন
বারবার আছড়ে পড়ে সামাজিকতার ঠোক্কর
নিজেকে নিয়েই হাসি নিজেকেই বিদ্রুপ করি
পরম যত্নে কাছে টানি তাকে কবিতাকে ভালোবাসি
হোক হাসাহাসি তবু আমি নাছোড়বান্দা প্রেমিক
ধাক্কা খেলে পড়ে যেতে পারি
চোট খেতে পারি বরাবর তবু লড়ে
যাব বাগিয়ে কলম আঁকব খাতায়
আদরে মমতায় বর্ণমালার বিচিত্ররূপ।

সংক্রান্তির স্বপ্নমালা

সোমনাথ ব্যানার্জী

শহরে জমছে অসহিষ্ণু আবর্জনা
না, হয়ত কথার ভুল
ধর্ম কি কখনো হয় আবর্জনা?
সে তো পবিত্র,
আমাদের এক বৃন্তে তো
দুটো কুসুমই থেকে এসেছে,
তবে আজ কি হল?
চোখে পট্টি বেঁধে
নতুন রকম কানামাছি খেলা?

কবিতায় শিল্পে ধর্ম ধ্বজাধারীদের রক্ত চোখ,
আক্রমণ ....
সামনে কি তবে বিস্ফোরণ??

নিশ্চুপে কারা যেন শান দেয় অস্ত্রে
হাওয়া দেয় আগুনে
বুনতে থাকে ইন্দ্রজাল

ডাস্টবিন থেকে তুলে আনা শিশুর
আড়ালে স্বার্থের কথা শুনি,
শুনি ধর্মান্তকরনের লিপ্সা মায়ের ভালোবাসায়
তাদের জীবনদান তবে আজ গৌণ??

কোনো সদুত্তর শুনছি না চারপাশে
সবাই চুপ কোন আশঙ্কায়??
দেখি ধাপার মাঠে ধর্মগুরুরা শুয়ে
হাতে হাত, চলছে আলোচনা;
মৌলবাদের অস্ত্রে
মানুষগুলো নিপাত যাক।

হারিয়ে যেতে যেতে ফিরে আসে স্বপ্ন
নববর্ষের, নতুন সকালের
ফিরে আসে এক হবার গল্প ...
আকাশের বুক চিরে সূর্যোদয় হয়
ধর্মের অন্ধকার হয় দূর
বাতাসে ছড়িয়ে যায় মানুষের জয় গান।

জঞ্জাল মঙ্গল

সাধন চট্টোপাধ্যায়

সরকারি ভ্যাট উপচে জঞ্জালের পাহাড় রাস্তায়। গাড়ি-ঘোড়া, লরি, মটোর সাইকেল—এমন কি মানুষ-চলাচল দায় হয়ে উঠেছে। তার ওপর ছানা-পোনা-ধাড়ি শুয়োরের মৌরসিপাট্টায় ল-অর্ডারের সমস্যা। কোনো পুঁচকি বাচ্চাও যদি বে-সতর্কে গাড়ির নিচে পড়ে, ধুন্দুমার কাণ্ড হয়ে যাবে। আস্তাকুঁড়ের দুপাশেই সার সার গাড়ি নড়বে-চড়বে না। দরকার হলে দু-চারখানাকে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। একেই শুয়োর জাতির আবেগের তাণ্ডব।

শেষে একদিন থানা ফোর্স পাঠিয়ে, লাঠিচার্জ করে জঞ্জালের পাহাড় শুয়োরমুক্ত করে দিল। পাবলিকের স্বস্তি। হলে কি হবে, দলে দলে কোত্থেকে গোরু এসে নির্বিঘ্নে রাস্তা জুড়ে ডাঁই চিবোতে থাকে। কাদের গোরু, ব্যবসা করে কারা—তদন্তেও বেরুতে চায় না। গোরুগুলো খোসা, পচা, প্লাস্টিক থেকে বিয়ে বাড়ির কাগজের থালা, রাংতা সবই খাচ্ছে আজকাল।

ব্যাপারটা যে জনগণের স্বার্থ-বিরোধী—একজন গোরু-উকিল মেনে নিল। ঘাস-খড়-ভুষিখাওয়া দুধের বদলে, এ-সব খেলে, যে দুধ বেরুবে, তার ছানা-পনির দই থেকে নির্ঘাত ক্যানসার, হার্টঅ্যাটাক, জন্ডিস্—মায় অজানা জ্বরেও মরতে পারে। গোরু-উকিল দলবলকে বলল, তোমাদের এ অধঃপতন কেন? যারা ঘাস-বিচুলি ভুষি খেতে, এখন এসব গিলছ?

গোরুদের একজন করুণ মুখে জানাল, আমাদের পালুয়েদের বলুন। ... ছোলা-ভুষি-খড়ের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, ফ্ল্যাটের বন্যায় ঘাসটুকু নেই .... আমাদের ভোরেই রাস্তায় খেদিয়ে, রাতে ওলানে জল ছিটিয়ে দুধ নিংড়ে, দড়ি বাঁধা করে, ফের সকালে ছুটি .... জঞ্জাল দিয়ে পেট না ভরালে আমরাই বা বাঁচি কি ভাবে।

গোরু-উকিল বল্লেন, কোর্টে যাচ্ছ না কেন দলবেঁধে ... মালিকরা ক্ষতিপূরণে বাধ্য.... সম্পূর্ণ বে-আইনি কাজ হচ্ছে।

বৃদ্ধ গোরুটি অবাক।

কোর্টে? টাকা কোথায়? বিনে পয়সায় কে লড়বে আমাদের হয়ে?

বেশ। ক্ষতিপূরণের টাকা যদি পেয়ে যাও, পঁচিশ পার্সেন্টে রাজি আছ তোমরা?

আমাদের গোরু-মাথা। অঙ্ক বুঝি না। খবরের কাগজের মতো খোলসা ভাষায় বলুন।

উকিল হেসে বল্লেন, যাতা বোকো না। খবরের কাগজে বুঝি মানুষ বোঝার ভাষা থাকে না? যাক্ গে যাক্, যদি চার লাখ ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দিতে পারি তোমাদের, আমাকে এক লাখ দিতে হবে। ... মামলা চলাকালীন কিছু দিতে হবে না।

গোরু-রা মহা খুশিতে রাজি। জনস্বার্থ বিঘ্ন বলে আদালতে কেস্ উঠল। সওয়াল চলল। এবং গোরু-উকিলের কেরামতিতে কেসও জেতা হল। ক্ষতিপূরণ চার লাখ টাকা।

গোরুবৃন্দ আস্তাকুঁড়-মুখো হল না। টাকার আশায় আশায় ভারি আনন্দে আছে। মালিকরা যার যার গোরু দিনভর বেঁধে রাখে, রাস্তায় বেরুতে দেয় না—বাজার থেকে খোল-খড়-ভুষি কিনে খাওয়ানোর ব্যাপারেও রহস্যজনকভাবে নীরব। গোরুরা পড়ল ফ্যাসাদে। কারণ জানতে এলে, শুকনো মুখে গোরু-উকিল বল্লেন, মালিকরা ডিভিশন বেঞ্চে গেছে, শুনছি দরকারে সুপ্রিম কোর্টেও যাবে।

তালে?

কথা দিয়েছি তোমাদের। ... বিনে পয়সায় লড়ব আপাতত। যদ্দিন লাগে।

আমরা যে একদিনও সইতে পারছি না। গোরুগুলো হাঁচতে শুরু করল।

গোরু-উকিল বল্লেন, দ্বিতীয় রাস্তা, কোর্টের বাইরে বোঝাপড়া করে নেয়া। ... রাজি আপনারা? —দিনে এসে আস্তাকুঁড় খেলে, রাতে খানিক খড়ভুষি দিল। দুধের মূল্যবৃদ্ধির অধিকার অবশ্য মালিকদের ছাড়তে হবে।

গোরুরা বল্ল, আমরা অবলা জীব স্যার! ... আপনিই পথ বাতলে দিন।

সুযোগে ফের জঞ্জাল উপচিয়ে উঠল। গড়ালো রাস্তায়। পাহাড় হয়ে উঠল। পাছে শুয়োরের দল পুরনো অধিকারে ফিরে আসে, পুলিশ-পাহারা বসল। গোরুদেরও যার যার মালিক বাঁধন খোলে না। সুযোগে একদল কুকুর জঞ্জালের পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল। দুপাশে সারসার যান জট, মানুষের দুর্ভোগ। কেউ কেউ কুকুরদের উদ্দেশে হুমকি ছুঁড়ল, ওখানে কী করছ? ফাকা করে দাও। বৃদ্ধ কুকুর একটি হাই তুলে বল্ল, আমরা সরমার সন্তান। অভিশাপ পর্বে আছি। ধৈর্য ধরতে হবে।

পাবলিক ফ্ল্যাটে যার যার দরজা-জানালা এঁটে দূষণমুক্ত হতে উন্নততর প্রযুক্তির মার্কেটে খোঁজ করে। বড্ড দুর্গন্ধ বাতাসে!

মানবিকতার ডাস্টবিন

মানুষের মাংস

শুভংকর গুহ

আজ রবিবার। সকালে, নরহরিকে ঘরের দক্ষিণ দিকের জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রমীলা মনে মনে আগুন হয়ে গেল। এই সাতসকালে ওখানে নরহরির দাঁড়ানোর কথা নয়। কী করছে এখন ওখানে মানুষটা? দুপুরবেলায় ওই জানালাটির কাছে প্রমীলা দাঁড়াবে। সংসারের সমস্ত কাজের শেষে, ক্লান্তিতে পান চিবোবে আর পানের পিক্ ফেলবে।

একটাই ঘর নরহরির। ঘরটির বাঁদিকে আট ফুট বাই আট ফুটের একটি রান্নাঘর। রান্নাঘরে জানলা নেই। আছে দুটি ভেন্টিলেটার। দিনের আলো ঢোকে না। আলো জ্বালিয়ে রান্না করতে হয়। সংসারে তিনটি প্রাণী। নরহরি, প্রমীলা আর কিশোর বয়সের একটি ছেলে, নাম খোকন। ভালো নাম আর ডাক নাম বলতে ওই একটিই। রান্নাঘরের ভেতরে অনেক জঞ্জাল। খবরের কাগজ, ঘুটের বস্তা, নারকোলের খোল, তেলের পাউচ, ইঁদুর মারার কল, লণ্ঠনের চিমনি, চালের টিন, ছেঁড়া চামড়ার হাওয়াই চটি, স্নান করার বালতি এবং ছেঁড়া জুতো ও চপ্পল।

প্রমীলা প্রায় রোজ খিচ্ খিচ্ করে। নরহরিকে রান্নাঘর থেকে এসব আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে বলে। নরহরিও তর্ক করে না। বলে, কাল করব—বলতে-বলতে মাস গড়িয়ে যায়। রান্নার ঘর ছাড়া আর সেই একটিই ঘর। এই ঘরেই প্রমীলা এবং নরহরির স্বপ্ন, আশা, ক্ষুধা, লালসা, ক্রোধ, অভাব অনটন ও টানাটানির সংসার রোজ ঘুমিয়ে পড়ে আবার সকালে জেগে ওঠে। ঘরে দুটি জানলা আছে। একটি উত্তর দিকে আরেকটি দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ দিকের জানলাটি প্রমীলার পছন্দ। তাই সে সবসময় দক্ষিণ দিকের জানলা দিয়ে ঘরের বাইরে পৃথিবীটাকে দেখতে-দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। উত্তরদিকের জানলার পাশেই দরজা। দরজার ডানদিকে হুকে ঝোলানো আছে নতুন একটি ছাতা। ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে ছাতাটা এখন নবীন অতিথি। গেল সপ্তাহে নরহরি কিনে এনেছে। অপেক্ষা করছে, বৃষ্টির ফোঁটার জন্য। গত বছরের বৃষ্টির মরশুমে তাকে কাক-ভেজা ভিজতে হয়েছে। দৈনিক বাজারের বাজেট কমিয়ে ছাতাটা কেনার অর্থ জোগাড় করেছে একজন পাকা অর্থমন্ত্রীর মত।

প্রমীলা বলে—ওখানে তুমি কী করছ? বাজার হবে না আজ? এই সাতসকালে দাঁতের কোণ খুটলেই হবে? কত দেরি হয়ে যাবে বুঝতে পারছ না ...

নরহরি দলা পাকিয়ে থুতু ফেলে। ঢোক গেলে। ভাবছে দুর্মূল্যের বাজারে কথাটা সে কি করে বলবে? কথাটা বললেই প্রমীলা ক্ষেপে আগুন হয়ে যাবে। গতকাল শনিবার ছিল। অফিসে হাফ-ডে। ফেরার পথে মাংস কিনে এনেছিল। খোকন অনেকদিন মাংস খায় না বলে। ছেলেটার এই বয়সে অনেক কিছুই খাওয়া উচিত। কিন্তু যা রোজগার, মন চাইলেও সাধ্যে কুলিয়ে ওঠে না। তাছাড়া মাংসের যা দাম। পরপর দু'দিন মাংস খেলে দরিদ্রের বিবেক যে ফোঁস করে উঠবে।

প্রমীলা বাজারের ব্যাগ নিয়ে দাঁড়াল। নরহরি বলল,

তুমি কিন্তু গতকাল সুন্দর মাংস রান্না করেছিলে।

একটু শক্ত ছিল না গো? মাংসটা বোধহয় কচি পাঁঠার ছিল না।

না, ভালোই তো সেদ্ধ হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, এমন সুন্দর গন্ধের যাদু ছিল ভাবাই যায় না। এখনও হাতের তালু থেকে গন্ধ শুকোয়নি। নরহরি হাত থেকে সাধ্য মতন গন্ধ শুঁকে নিল।

স্বামীর এই আদিখ্যেতা দেখে প্রমীলা অবাক হয়ে গেল। বেশ মজাও পেল, বলল,

তাহলে বলো, আমার রান্নায় ম্যাজিক আছে?

নরহরি খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল,

নিশ্চয়ই। তোমার হাতে এত সুন্দর মাংস রান্না অনেকদিন খাইন। তোমাকে একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো?

বলো।

আগে কথা দাও, তাহলে বলব।

নরহরির কথা ঠোঁটে এসেও আটকে গেল। সম্পূর্ণ সাহস সে পেল না। একটু মনে মনে ভাবল, কি করে বলি, বিবাহিত জীবনে একদিনের জন্যও যে তোমার মন ভেজাতে পারিনি। দুঃখ হয়। হয়তো আমারই নিজের অক্ষমতা। একটা চাপা ভয় তাকে জড়িয়ে ধরল। তবুও এক নিঃশ্বাসে যতটা সম্ভব সাহসকে সঞ্চয় করে বলল,

তুমি যদি অনুমতি দাও, তাহলে আজও মাংস নিয়ে আসি।

বলো কি গো? আজকেও? প্রমীলা ফোঁস করে ওঠে। খোকনের মাস্টারকে এখনও মাইনে দেওয়া হয়নি। মুদির দোকান থেকে নিমাই এসেছিল। টাকা দেওয়া হয়নি। দুধওয়ালা পর্যন্ত টাকা পায়নি। লাইটের বিল জমা দেওয়া হয়নি। অথচ এ মাসটা তো শেষ হয়ে গেল। কত কিছু বাকি পড়ে গেল। মাস শেষ হতে আর মাত্র ছ-সাতদিন বাকি। হাতে মাত্র একশোটা টাকা আছে। কি বে-আক্কেল মানুষ গো তুমি। এই নাও ব্যাগ। জ্যান্ত পোনা মাছ আনবে। পাঁচ-ছ টাকার মধ্যে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? দেরী কোরো না।

নরহরি চুপসে গেল। বাজারের ব্যাগটা হাতে নিল। কিন্তু ঘরের ভেতরেই দাঁড়িয়ে রইল। টেবিলের কাছে এসে হাত ঘড়িতে চাবির দম দিতে-দিতে সকালের তাজা খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে পনেরো বছর আগের একটি ভুলের কথা ভাবতেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মাসের মাইনে হাতে পেয়ে গেলে সে সবটাই প্রমীলার হাতে তুলে দেয়। এমনকি প্রতিদিন অফিস যাওয়ার বাসের ভাড়া এবং সিগারেট বিড়ির নেশার পয়সা পর্যন্ত প্রমীলার কাছে না চাইলে পাওয়া যায় না। স্ত্রীর হাতে, সমস্ত টাকা দিয়ে দিলে, নিজের ইচ্ছেটাও পরাধীন হয়ে যায়। ব্যক্তিগত শখ-আহ্লাদ বলে কিছু থাকে না। বিবাহিত জীবনটা নরহরির ছক কষে চলতে হয়েছে। একটু অন্যরকমভাবে বেঁচে থাকার কথা ভাবলেই সিগারেট অথবা বিড়ির নেশাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। নরহরি একটা বিড়ি দু আঙুলের ফাঁকে আটকে কানের কাছে রগড়ালো তারপর ঠোঁটে গুঁজে, ধরাল। বিড়ির ধোঁয়াটা বিস্বাদ লাগছে। মজাটাই যেন মজে গেছে।

প্রমীলা বলল—এখনই তো বাজারের দিকেই যাবে। এখন বিড়ি ধরানোর কি হল? ঘরের আগুন নিয়ে বাইরে যাবে না। অনেকদিন লক্ষ্য করছি অফিস থেকে ফেরার সময় তুমি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকছো। বাইরের আগুন নিয়েও ঘরে ঢুকবে না।

নরহরি প্রমীলার এইসব সংস্কারের কোনই দাম দেয় না। যেমন, বিড়াল রাস্তা পার হলে যাওয়া-আসার সময় থুতু ছিটিয়ে আঙুল দিয়ে ক্রশ মার্ক করতে হয়, সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালালে বিছানায় শুয়ে থাকতে নেই, বাড়ির বাস্তু সাপ মারতে নেই, ভাত খাওয়ার সময় দলা পাকিয়ে রাখতে নেই, অন্তত বাবা-মা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যদি বেঁচে থাকে। আসলে প্রমীলার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো কিছু ঘটুক নরহরি তা চায় না। তবুও সিগারেটের ঘটনাটি ঘটিয়ে ফেলে অভ্যাসের ভুলে। প্রমীলার নরহরির এই সামান্য শখ, নেশাটুকুও পছন্দ নয়।

প্রমীলা বলে, প্রায়ই বলে—সিগারেট বিড়ি খেওনা, ওতে পয়সা পোড়ে। স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। ওই আগুন ধোঁয়ার নেশাটা ছেড়ে দাও। না ছাড়লে, একদিন ভীষণ অশান্তি হবে। যেদিকে দুই চোখের দৃষ্টি যাবে, চলে যাব। যদি তোমার ক্যান্সার হয়। খোকনের দায়িত্ব, ওকে মানুষ করতে হবে। তোমার কিছু হয়ে গেলে আমি কোথায় দাঁড়াব? সিগারেট বিড়ির নেশাতে হার্টের ক্ষতি হয়। এটা কি ভেবেছ?

নরহরি জানে প্রমীলা কোনদিনই চলে যাবে না। সংসারটাকে সে রোজকার আলো বাতাসের মতন ভালবাসে। নরহরিও কিছুতেই নেশা ছাড়বে না। প্রমীলা কি বুঝতে পারে না, প্রতিটি মানুষের জীবনে কিছু শৌখিন অবলম্বনের প্রয়োজন হয়? নরহরি মনে করে, অভাব-অনটন-টানাটানির সংসারে ধূমপান তার কাছে শৌখিন নেশার মতন। অন্য কোন বাইরের নেশা তার নেই। গান শোনার অভ্যাসও তার নেই। নেই বিদেশী সুগন্ধি সাবান সংগ্রহের অথবা ফুলের বাগানের নেশা। ঘুম থেকে ওঠা, নাওয়া-খাওয়া, অফিসে যাওয়া। ছুটির দিনটা প্রত্যেক দিনের মতন না হলেও প্রায় সব ছুটির দিন একই রকমভাবে কেটে যায় নরহরির।

নরহরি চৌকাঠ পেরিয়ে, বাজারের ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠোনটা পেরিয়েই গেছিল প্রায়।

প্রমীলা পিছন থেকে ডাকে—শুনতে পারছ না? কী হল? শুনে যাও। রসুন আনবে, পেঁয়াজও আনবে। আদা যেন বাদ না যায়। অল্প আছে কুলোবে না। আর পাঁচশো গ্রামের মতো চন্দ্রমুখী আলু। টক দই। মশলা আনতে হবে না, ঘরে আছে।

নরহরি অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়।

যেন চকিতে দশফুট লাফাতে পারবে এমন অবস্থা। এক অভিনব আনন্দে তার মন ভরে যায়। সচরাচর এমন হয় না। প্রমীলার মন কিন্তু সহজে গলে যায় না। নরহরি বুঝতে পারল, বয়স বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলার জেদি মনোভাবটাও দুর্বল হয়ে গেছে।

আসলে কিন্তু তা নয়। নরহরির বিষন্ন মুখটাই প্রমীলাকে নাড়া দিয়েছিল। প্রমীলার মনটাও হঠাৎ যেন ভিজে গেল।

সংসারের জন্য মানুষটা তার শখ-আহ্লাদ সব কিছু বিসর্জন দিয়েছে। পরপর দুটো দিন মাংস খাওয়ার ইচ্ছে হতেই পারে। সে ইচ্ছের কোনও দোষ নেই।

প্রমীলা মুচকি মুচকি হাসছিল। নরহরি আলমারির চাবি চাইল। গোটা একশো টাকাই লাগবে। প্রমীলা বালিশের তলা থেকে চাপা দেওয়া চাবির গোছা নরহরির চোখের সামনে মেলে ধরল। চাবির গোছা তখন ডানদিক থেকে বাঁদিকে বেশ দুলে যাচ্ছিল। নরহরির চোখ ও মুখ খুশিতে দুলতে থাকে।

প্রলীলা বলে—ওই একশো টাকাটা আলাদা করে রেখেছিলেন।

নরহরি কথাটা যেন শুনতে পেল না।

আজ রবিবার বলেই মাংসের দোকানে বেশ ভিড়। লম্বা লাইন। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটি মানুষ বেশ খোশ মেজাজে আছে। হয়ত মাংস খাবে বলে। নিশ্চয়ই এই মাংসের লাইনে দু'চার জন এমন আছে, যারা মাসের শেষ সম্বলটুকু নিয়ে দাঁড়িয়েছে মাংস কিনবে বলে। জিভ খুব সাংঘাতিক। মাংসের দোকানের পাশেই কাঁচা তরিতরকারির দোকান। কুমড়ো, ঝিঙে, পুঁইডাটা অথবা লেবু—এসবের সঙ্গে মানুষের দেহের কোনও মিল নেই। কিন্তু পশুর মাংস আর মানুষের মাংস, দেখতে একই রকম। মানুষের মাংসের রঙ কিন্তু নীল নয়, পশুর আর মানুষের রক্তের রঙ লাল। স্বাদের কথাটা বলা কঠিন। মানুষ পশুর মাংস খেলেও মানুষ তো আর মানুষের মাংস খায় না?

নরহরির চিন্তা হোঁচট খেল।

মানুষের মাংস। দু'-দুটো বিদেশী গল্প পড়েছিল। তাও ছাত্রজীবনে। কলেজ লাইব্রেরিতে। বেশ লেগেছিল গল্পটা। নরহরির মনে আছে। প্রাচীনকালে মুনি ঋষিরা মানুষের মাংস রোস্ট করে সোমরস নিয়ে ভক্ষণ করত। সে ভাবতে থাকে, সমাজে যারা অপাংক্তেয় তাদের জবাই করা যেতেই পারে। তাহলে মানব জঙ্গলও কিছুটা হাল্কা হবে। এবং মাংসের চাহিদার জন্য মানুষের দামও বাড়বে। তাছাড়া খাদ্য সমস্যাও তো কিছুটা কমে যাবে। মানুষ যে মানুষের মাংস কখনও খায়নি এমন তো নয়। ইতিহাসেও প্রচুর প্রমাণ আছে। অনেক প্রাণী আছে যারা স্বজাতির মাংসও খায়। তাহলে, মানুষ খেলে দোষের কী? মানুষ তো সেই অর্থে আর বন্য নয়। কিন্তু মানুষ মানুষেরই জঙ্গলে বাস করছে। মানুষের জঙ্গল। মানুষ তো সভ্য। পুঁথিগত বিদ্যা আছে। গায়ে বস্ত্রও আছে। সব জানোয়ারের মতন মানুষেরও মন আছে। সেই মনের গভীরে যেমন প্রেম আছে তেমনি লোভও আছে, হিংস্রতা আছে। আছে বিশ্বাসঘাতকতা। মানুষ কিন্তু শিকারের লোভে নয়, মানুষের সঙ্গে ভালো মানুষ হয়ে বাঁচবে বলে, এই পৃথিবীর আলো হাওয়ার মধ্যে জন্ম নেয়।

এসব কি ভাবছে নরহরি। এগুলো কি ভাবনা? ভাবনাটা কেমন জানি দেহ ও মনে তাকে ক্লান্ত করে দিচ্ছে। নরহরি অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। মানুষের মাংস খাওয়া—সে কি নরভোজী? এসব কেন ভাবছে? বুকের ভেতর কি রকম একটা অচেনা যন্ত্রণা হচ্ছে। মানুষের যন্ত্রণাময় এই ভেতরটা ছোঁয়াও যায় না, দেখাও যায় না। হঠাৎ এখনই নরমাংস ভোজের বিদেশী গল্পটা যে কেন মনে পড়ল ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, নিজেই ঘেন্নায় শিউরে উঠল নরহরি।

মাংস কেনার লাইন ক্রমশ বড় হচ্ছে। অনেক লম্বা হয়ে গেছে। পরিচিত কয়েকজনকেও চোখে পড়ল। তারাও নরহরিকে দেখছে। নরহরির ঠিক সামনে যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন তিনিও নরহরিকে চেনেন। বললেন,

আর বলবেন না মশাই, জামাই এসেছে মাসের শেষে। দুর্গাপুরে থাকে। আসে না খুব একটা, পুজোর সময় আসে। এখন এসেছে কলকাতায়, কাজ আছে। নরহরির ঠিক পিছনে যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, তিনি বললেন,

ডাক্তারবাবু বলেছেন মেটে খেতে, কে জানে কাসিম মিঞা মেটে দেবে কিনা ....

আরে শেখ মুখতার মশাই যে, নরহরি বলল।

ভদ্রলোক একগাল হেসে দিলেন। বড় রাস্তায় ছাতার দোকান আছে। ভদ্রলোক কিন্তু হিন্দু। ওনাকে ফিল্মস্টার শেখ মুখতারের মতন দেখতে বলে, সবাই তাকে শেখ মুখতার নামে ডাকে। শেখ মুখতার বলল,

মার মৃত্যুর পরে, আজ এই প্রথম মাংস কিনতে এলুম। বাড়ির সবাই বলল যে ...

নরহরি ভাবল নতুন জামাইকে যদি মানুষের মেটের ঝাল খেতে দেওয়া হয়, তাহলে বেশ হয়। মানুষের শরীরে কি মেটে হয়? কেন হবে না? সব জন্তু-জানোয়ারের শরীরে মেটে আছে। মানুষ, কুকুর, পাঁঠা, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর, হাতি, বাঘ, গাধা সবারই মেটে আছে। নরহরি ফিক্ করে হেসে ফেলল। ছেলেবেলায় তোতলা মাস্টারকে দেখে ঠিক এইভাবে হাসত। পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে একশো টাকার নোটটাকে ঘেটে নিল। কড়কড়ে নোট। এই টাকাটা দিয়েই আজ সে মাংস কিনবে। কিসের মাংস? প্রমীলার কথা শুনলেই ভালো হত। একজন ছাপোষা কেরানীর পরপর দু'দিন মাংস খাওয়া মোটেই মানায় না।

হ্যাঁ তাই তো? নরহরি কি ভুল দেখছে? মানুষের লাশই তো। লাশকাটা ঘরে মানুষের এমন লাশ সে কত দেখেছে।

টুকরো হয়ে পড়ে থাকা মানুষের লাশ। কাসিম মিঞা লাশটিকে আঙটায় ঝুলিয়ে রেখেছে। জল দিয়ে ধুয়ে ফেলেছে। নাভির নিচ থেকে শরীরটাকে ভাগ করেছে। মোটা মোটা পা। নিম্নাঙ্গটা আলাদাভাবে কেটে ফেলেছে। চোখ দুটো খোলা। অসম্ভব সাদা। চুলের সামনেটা জলে ভিজে গেছে। কপালের কাছে লেপ্টে আছে চুলগুলো। কচি গোলাপের পাপড়ির মতো রঙ মাংসটার। হাতের আঙুলগুলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, তাজা বকফুলের মতো গন্ধ। মানুষের শরীরের ভেতরের গন্ধ। গন্ধটা নরহরি একটানে যতটা নেওয়া যায়, নিল।

ঝলমলে রোদে, সকালটা বেশ নড়েচড়ে উঠেছে। রবিবারের সকালের বাজার। কোলাহল মুখর। কাচা হলুদ রঙের রোদ মানুষটার লাশের ওপর গিয়ে পড়েছে। লাশটাও তাজা গোলাপি রঙের হয়ে উঠেছে, আর বেশ উত্তাপময়। মানুষের শরীরের উত্তাপটা বোধহয় অন্যান্য প্রাণীর দেহের থেকে বেশি। কাসিম সেইজন্যই বোধহয় বারে বারে জল ছিটাচ্ছে। মাথাটা কাঠের পাটাতনে রাখা। ঠোঁট ফাঁক করা, রক্তের দাগে ভর্তি পোক্ত দাঁতগুলোতে দীর্ঘদিন পান খাওয়ার অভ্যাসের ছাপ আছে। নরহরি লাইনে দাঁড়িয়ে যতখানি ঝুঁকে পড়া সম্ভব, ঠিক ততটাই ঝুঁকে মাথাটাকে শনাক্ত করার চেষ্টা করল। বয়স কত হবে? লোকটার। আটান্ন কি ষাট ছুঁই-ছুঁই। নরহরি শিউরে উঠল। তার বয়সও তো প্রায় আটচল্লিশ হয়ে গেল।

মাংস কেনার পক্ষে এই ভদ্রলোক বোধহয় বেশ পোড় খাওয়া, তিনি বললেন

এত বড় পাঁঠার মাথা। মাংসটা সেদ্ধ হলে হয়।

নরহরি কেন জানি ভয় পেয়ে গেল। চোখের সামনে শুধু নিজের সংসারটা ভেসে উঠল। মাসের মাইনেটা হাতে পেলে তারপরের দিন থেকেই ত্রিশ অথবা একত্রিশ সংখ্যার দিকে চাতক পাখির মতন তাকিয়ে থাকতে হয়। প্রোটিনের অভাবে ছেলেটা দিনে দিনে রোগা হয়ে যাচ্ছে। কোনো-কোনো দিন নরহরির সংসারের বাসিন্দাদের শুধুমাত্র সেদ্ধভাত খেয়ে কাটাতে হয়। প্রমীলাও অর্থের টানাটানির কথা ভাবতে ভাবতে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝে খোটে।

খোকনের ধুলো ভর্তি পা। ফুটবল খেলে ফিরল। প্রমীলা উনুনে আঁচ দিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিচ্ছে। মাসের শেষে সাবান ফুরিয়ে এলে আটার ভুষি দিয়ে রগড়ে হাতে ধুতে হয়। হাত পরিষ্কার করে আটা মাখবে। নরহরির পরিবার রাত্রে রুটি খায়। চালের যা দাম। প্রমীলা দিনের বেলায় কোনোদিন লণ্ঠনের চিমনি পরিষ্কার করে না। সন্ধ্যাবেলাতেই করতে হবে। যা লোডশেডিং হয়। খোকনের পড়াশুনা যাতে অসুবিধা না হয়, তার জন্য এই প্রস্তুতি। সংসারের এইসব খুটিনাটি ছবির কথা ভাবতে ভাবতে নরহরি বিভোর হয়ে গেল। সংসারের এই অভাবেও মোহময় এই জীবন ছেড়ে কারই বা মরতে ইচ্ছে হয়।

কিগো এত দেরি করলে যে? সেই কখন গেলে, আর এই এলে?

নরহরি টলছিল, মাতাল যেভাবে টলে। কেমন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। বাজারের ব্যাগটা প্রমীলার হাতে দিয়ে বলল,

এই নাও, মানুষটার অনেক বয়স হয়েছিল। বুড়ো মানুষের মাংস। দামে কম, খেতেও ভাল। পাঁঠার মাংস আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না। পাঁঠা, ছাগল, খাসি, ভেড়া সব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষ প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে। এখন থেকে বুড়ো মানুষের মাংসই খেতে হবে। কচি মাংস পাবে না। কচি মানুষ হত্যা করা আইনত দণ্ডনীয়।

মাংসের লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে রোদ ও অপেক্ষায় মানুষটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নরখাদকের মতন কথা বলছে। প্রমীলা বলল,

ঘেন্না পিত্তি সব জলে ভাসিয়েছ। বিয়ের পর থেকে আমার মাংস খেলে, তাতেও মন ভরল না ...

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নরহরি উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলল, কিছুদিন পরে আমার মাংস খাবে। এই আটান্ন বছরের বুড়ো শরীরটাকে প্রেসারে সেদ্ধ করলেও গলবে না।

তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?

কেন? পাগল হওয়ার কী দেখলে? অনেক প্রাণীই তো স্বজাতির মাংস খায়। মানুষ খেলেই অন্যায়? তাছাড়া আজ না হোক, মানুষ তো মানুষকে খাবেই।

তুমি কি জানো না, মানুষ হল নারায়ণ। তুমি কি আমার আর খোকনের মাংস খেতে পারবে? ছিঃ।

আমি তোমাদের থেকে অনেক বড়। এখন ক্রমশ বৃদ্ধিও হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের খাওয়ার সুযোগ আমার আর হবে না।

প্রমীলা আচমকাই নরহরিকে একটু জোরে ঠ্যালা মারল। নরহরি ধপাস করে তক্তপোশের ওপরে বসে পড়ল। প্রমীলার কেমন যেন ভয়-ভয় করতে থাকল। নরহরিকে এমন ভারসাম্যহীন হয়ে যেতে কোনোদিন দেখেনি। প্রমীলাও তো কোনদিন ভাবেনি, মানুষও তো মানুষের মাংস খেতে পারে।

ছুটির দিনে সময় যেন দৌড়ে চলে। ঘড়ির কাঁটাটাও যেন বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। একলাফে, বারোটার ঘরে চলে যায়। পাশের বাড়ির পাঁচিলের উপর কাকটাও আজ যেন তাড়াতাড়ি এসে গেল। এখন অনেকক্ষণ কা-কা করে ডাকবে। প্রমীলাও ব্যস্ত হয়ে উঠল। আজকে কাজটাও যেন কিছুতেই শেষ

হচ্ছে না। মনে মনে নরহরিকে কিছুক্ষণ দুষলো সে। বুড়ো বয়সে মানুষটার ভীমরতি ধরেছে। প্রমীলা অভিমানে আপনমনে গজরাতে থাকল, সকাল থেকে কতক্ষণ আর না খেয়ে থাকা যায়। খোকন সেই কতক্ষণ খেয়ে চলে গেছে, পাশের বাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে। ওর এঁটো থালা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। প্রমীলা খোকনের এঁটো থালা তুলতে গিয়ে দেখে, নরহরি দেয়ালে টাঙানো মা কালীর ক্যালেন্ডার খুলে রোল করে গুটিয়ে রাখছে। প্রমীলা দেখে অবাক হয়ে গেল। বলল,

একি? মায়ের ক্যালেন্ডারটা খুলে ফেললে কেন? আমি স্নান করে রোজ মাকে প্রণাম করি, তুমি জান না?

মায়ের হাতে খড়গটা দেখে আমার খুব ভয় লাগছে। কেমন রক্ত মাখানো।

অলক্ষুণে কথা বলতে মুখে আটকাচ্ছে না। এই দুপুরে কী অমঙ্গুলে কথা গো। মাকে দেখে ভয় লাগে? সংসারের ভালো হবে, এই জন্যই তো ....

আঃ, একটু চুপ করলে ভালো হয়, আমার শরীর ভলো নেই।

ঠাকুরের আসনে ক্যালেন্ডারটা রেখে দাও। আমি স্নান করে এসে টাঙিয়ে দেব আবার। দেরি কোরো না, খেয়ে নাও। আমার জন্য বসে থাকতে হবে না। আমার এখনো অনেক কাজ বাকি। কলের জলও চলে যাবে। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

নরহরি খেতে বসল। কিন্তু খাওয়াতে একদম রুচি নেই। বমি আসছিল। দম ঠেলে উল্টিয়ে আসছিল। সমস্ত শরীর কেমন গুলিয়ে উঠেছিল। পেটের ভেতরে পাকস্থলীটা কেমন যেন ঘুরপাক খাচ্ছে। শরীরের শিরা-উপশিরাগুলো কেঁপে-কেঁপে উঠছে। নরহরি এমনিতে খুব তাড়াতাড়ি খায়। শুধু খেতে বসার অপেক্ষা। কিন্তু আজকের মতন আস্তে খেতে প্রমীলা কোনোদিন নরহরিকে দেখেনি। বোধহয় মানুষটা অসুস্থ হয়ে গেছে। নরহরির কপালে হাত দিয়ে দেখল প্রমীলা, কপালটা বেশ গরম। অসুখ-টসুখ নরহরির জীবনে কোনোদিন লেখা নেই। তাহলে জ্বর কেন এল? প্রমীলা একটু অবাকই হয়ে গেল। বাজারে যাওয়ার আগে মানুষটা কিন্তু সুস্থ ছিল। প্রমীলা বলল,

আজ কি হয়েছে তোমার বলবে? আমি তোমাকে নয় যেন অন্য কাউকে দেখছি। জ্বরও হয়েছে, সকালে তো বেশ ছিলে ...

আমার জ্বর হয়েছে?

গা যে পুড়ে যাচ্ছে।

ভয়ে জ্বর হয়েছে। জানো প্রমীলা, আমার ভীষণ ভয় করছে। ভীষণ ভয়। আমার মনে হচ্ছে, থানার দারোগাবাবু যখন-তখন চলে আসতে পারে। হয়তো বলবে, তোমার নাম নথিভুক্ত হয়ে গেছে। কাসিম মিঞা তোমাকে আগামী মাসের পাঁচ তারিখে ধরে নিয়ে যাবে। তোমার সেদিন জবাই হবার দিন। তোমার জীবনের যাবতীয় ঘটনা আমরা বিচার করে দেখেছি, এখন তুমি এই সমাজের পক্ষে অপাংক্তেয়। অপাংক্তেয় মানুষকে সমাজ থেকে কমিয়ে ফেলাটাই সরকারের উদ্দেশ্য। এর জন্য বিশেষ একটি আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে, বর্তমানে এই আইনটাকে 'মানব কল্যাণ আইন' বলা হচ্ছে। এই আইনের ধারায় যিনি গ্রেপ্তার হবেন, তার কোনো প্রতিবাদই গ্রাহ্য হবে না। এই আইন চালু হওয়ায় জনসংখ্যা কমছে, বেকারদের চাকুরীও হচ্ছে। আর মানুষের বেঁচে থাকাটাও প্রতিযোগিতার রূপ নিচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, যে সব মানুষের সংক্রামক ব্যাধি আছে তারা এই আইনের আওতায় পড়বে না।

নরহরি পাগল হয়ে গেছিল কিনা, সে কথা ডাক্তার পরীক্ষা করার পরে বলতে পারে নি। তবে হ্যাঁ মানসিকভাবে সে অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। সাধারণ মানুষকে দেখে সে খুব ভয় পেত। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তার কুকুর, গরু, ছাগল, এইসব প্রাণীগুলোকে ডাকত। প্রমীলা বুঝতে পেরেছিল, ঘরের দেওয়ালের সাথে নরহরি শুধু একা কথা বলে যায়। ঘরের দেওয়াল সেই কথা শোনে না।

একদিন কালবৈশাখীর বিকেল বেলায় হাওয়ার ঝাপটায় দক্ষিণ দিকের জানলার পাল্লা দুটো নড়ে উঠল। ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেই দক্ষিণের জানলাটা যেন সংকেত বাণী ঘোষণা করল। প্রমীলার মনে হল ঘরের টেবিল, চেয়ার, আলমারি, দেওয়ালে টাঙানো ছবি-ক্যালেন্ডার-ফটো কেঁপে উঠল। প্রমীলার অভাব-অনটনের একঘেয়েমি জীবনটা হঠাৎ করে যেন মোচড় খেয়ে গেল। ভয়ে শিউরে উঠল প্রমীলা।

নরহরি বেশিদিন বাঁচেনি। গাছের ডাল থেকে শুকনো পাতা টস করে খসে পড়ার মতনই তার জীবনটা একদিন খসে গেল। প্রমীলা মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে নিয়ে খোকনকে বলল,

হিন্দুধর্মে বিধবাদের মাংস খেতে নেই। আর যদি কোনোদিন খাই, তবে মানুষের মাংসই খাবো।

খোকনকে দেখতে অনেকটা নরহরির মতো। অগোছালো ভাবে থাকে। চুল উসকোখুসকো, সচরাচর পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরে না। হাওয়াই চটির ব্যান্ড ছিঁড়ে গেলে, সেফটিপিনের ফাঁস লাগিয়েই চালিয়ে নেয়। অসম্ভব সাদা দুটো চোখ। হাতের আঙুলগুলো উত্তর ভারতের সন্ন্যাসীদের মতন লম্বা। গায়ের রঙ তামাটে। কোনো কথা ওকে বলা যায় না। কথা শুনলে, নিরুত্তর থাকে অথবা রেগে যায়। রাস্তায়, স্টেশনে, সিনেমা হলে, মাঠে

অথবা বাস স্ট্যান্ডের আশেপাশে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। শুধু মানুষ দেখে। কত রঙের মানুষ। সাদা, কালো, তামাটে। বেঁটে, মোটা, রোগা, লম্বা। কত মানুষ নিজেকে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে আবার অনেকেই অগোছালো। অথচ কেউ কিন্তু সহজেই কোনো ভীরুতার শিকার হয়ে পড়েনি। তার বাবা যেমন হয়েছিল। খোকন লক্ষ্য করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হয়। দেখা হয়ে গেলে তারা বলে, আবার দেখা হবে। কিন্তু কেউই সঠিক ভাবে বলতে পারে না সত্যিই দেখা হবে কিনা। আসলে, বিশ্বাসের দরজাগুলো যেন একটার পর একটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনেক রাতে খোকন ফিরে আসে। খিদের চেতনা না থাকলেও অভ্যাসবশত চুপি চুপি শুকনো রুটি খেয়ে নেয়। প্রমীলা অকাতরে ঘুমিয়ে থাকে। খোকন মাকে দেখে। গালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেছে। দুটো হাত শীর্ণ। আর মাথার চুলগুলো তুলোর মতো সাদা। সময় কি বিস্ময়করভাবে পালিয়ে গেছে। যে রাস্তা দিয়ে দুপুরে অলস ফিরিওয়ালা চলে যেত, সেই রাস্তায় এখন মাটি নেই, ধুলোও নেই। এ্যাসফল্টের ওপর রোদ পড়েছে কুচকুচে কালো রাস্তা চমকাচ্ছে। রাস্তা চওড়া হয়েছে। অনবরত ছুটে চলেছে মালবাহী ট্রাক, বাস, মিনিবাস ও অটো। কত সুবজ, কত গাছ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠা নীল রঙের জলাশয়গুলো। এখন শুধু বাড়ি আর কংক্রীটের জঙ্গল, আর সমুদ্রতটে পড়ে থাকা অসংখ্য বালি কণার মতো মানুষ আর মানুষের অসংখ্য মাথা।

খোকনের খাওয়া হয়ে গেলে, উত্তরদিকের জানালায় বাবার মতোন এসে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রমীলার কখনো-কখনো আচমকা ভুল হয়ে যায়। অনেকটা বাবার মতোই। সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে বলে,

তোর একটা কাজকর্ম হলে রক্ষা পাই। ঘোষদের বাড়িতে রান্না করতে আর ভালো লাগে না। অতগুলো লোকের রান্না। ভাতের হাঁড়িটা এত ভারি, নামাতে পারি না। একদিন কোমরে টান লেগে ভেঙ্গে পড়ে যাবে। তবে খাওয়া দেয় বলে মন চায় না ছাড়তে। দুজনের তো হয়ে যায়। কাজ থেকে ফিরে ঠোঙা বানাতেও আর ভালো লাগে না। তুই তো বানাতে পারিস। সারাদিন যে কোথায় ঘুরিস?

খোকন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক রাতও হয়ে গেছে। গভীর অন্ধকার জানলার বাইরে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে। এই অন্ধকার পার হয়ে গেলে জঙ্গল পাওয়া যাবে। সবুজ জঙ্গল। জনমানবহীন। ভীষণ নিস্তব্ধ। জঙ্গলে যাওয়ার জন্য হয়তো একটা রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়ে হয়তো অনেকদিন কেউ হেঁটেও যায়নি অথবা ফিরে আসেনি কখনও। খোকন যেন অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল, জানলার ওপার থেকে একটা পথ নেমে চলে গেছে, আবছা সাদা রঙের। এই পথ ধরে, সে এবং তার মা প্রমীলা যদি হেঁটে যায়, তাহলে ...

মা যাবে? চলো আমরা চলে যাই। কোনো এক অরণ্যে, যেখানে মানুষ থাকবে না। তোমাকে ভাতের হাঁড়িও নামাতে হবে না।

প্রমীলা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, খোকনের দিকে। এই নিস্তব্ধ রাত্রে, খোকনকে হঠাৎ যেন মনে হল এক অচেনা অরণ্যবাসী মানুষ।

যেন ভুলে গেছিল, প্রমীলা হঠাৎ বলল,

তোর বাবার একটা চিঠি পেলাম। ভাঁজ করা ছিল। কুষ্ঠীর সঙ্গে। চিঠি ঠিক নয়। সম্বোধন করে লেখা হয়নি। তোকেও না, আমাকেও না। এই দেখ চিঠিটা।

খোকন চিঠিটা পড়তে থাকল

"দক্ষিণ দিকের জানলা টপকিয়ে বেড়ালটা এই মাত্র চলে গেল। রোজই যায়। বুঝতে পারলাম, রাত প্রায় এগারোটা হয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাবে আগামী কালের ভোরের দিকে। আমার জীবনটাও স্তব্ধ হয়ে যাবে। এখন বুঝতে পারছি, আগামীকাল কাসিম মিঞার ধারালো কাটারির এক ঘায়ে আমার জীবনটা স্তব্ধ হয়ে যাবে। এই জীবনটাকে বড়ই ভালোবেসেছিলাম। জীবনটা তুচ্ছ হলেও, আমার নিজেরই তো ছিল। অনেক কিছু লেখার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু সময়ও খুব কম। শুধু একটা কথা বলে রাখি, দারোগাবাবু চুপিচুপি কিন্তু আমাকে চিরকুটটা দিয়ে গেছেন। আমার মৃত্যুর পরোয়ানা আমারই হাতে গুঁজে দিয়ে গেলেন। আমি একটুও অবাক হলাম না। মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম। মৃত্যু তো আমার হবেই। কিন্তু মানুষের খাদ্যবস্তু হয়ে যাবো এ কথা তো কোনোদিন ভাবিনি। ভয় কিন্তু আমার হচ্ছে না, যে ভয়টা হচ্ছে সেটা হল তোমাকেও একদিন ওরা ধরে নিয়ে যাবে, খোকনকেও নিয়ে যাবে। আজকে যারা খাদক, আগামীকাল তারা খাদ্যবস্তু হবে। ভোর হলে দারোগাবাবু আমাকে যখন ধরে নিয়ে যাবে, তুমি দৌড়ে আসবে, খোকনও আসবে। বলবে, দোহাই ওকে কাটবেন না। ও যে অনেকদিন আরো বাঁচত, অনেকদিন। দারোগাবাবু আমাকে টানতে-টানতে নিয়ে জীপে তুলবেন। যেভাবে বেচারি পাঁঠা, মাংসের দোকানে যায়। জীপ যখন চলতে শুরু করবে, তুমি আর খোকনও ছুটে আসবে। তোমাদের অনুসরণ করতে, হয়ত বা আরো অনেকে। ক্রমশ তুমি অসংখ্য তুমি হয়ে যাবে। খোকনও অসংখ্য খোকন হয়ে যাবে। একটা বড় মিছিল যেমন। কত মানুষ। প্রতিবাদী

মানুষ। যেন আমি এক নেতা, এই মানুষগুলোকে বোঝাতে পেরেছি, তোমরাও খাদ্যবস্তু হয়ে যাবে, একদিন এই শয়তান পুলিশ তোমাদেরই জবাই করবে। জীপটাকে ক্রমশ সবাই ঘেরাও করল। আমার মুক্তির জন্য রাস্তায় শুয়ে পড়ল। পথ অবরোধ হল। আমি একটু মজা করে দারোগাবাবুকে বললাম, আপনার নামও একদিন নথিভুক্ত হবে। তখন ওরা সবাই আপনাকে সেদ্ধ করে ভাত দিয়ে মেখে খেয়ে ফেলবে। দারোগাবাবু আমার ওপর চটে গেলেন। চোখও রাঙালেন। বললেন, চুপ কর। আমি ফিক্ করে হেসে দিলাম। বুঝতে পারলাম, দারোগাবাবুও ভয় পেয়ে গেছেন।"

চিঠিটার বেশ কিছু অংশে অসংখ্য কাটাকুটি। চিঠিটা শেষ হয়েও যেন শেষ হয়নি। শেষ দিকে, বেশ ভাঙ্গা হাতের লেখায় লেখা "দক্ষিণ দিকের জানলাটাও তোমাকে দিলাম, প্রমীলা। খোকনকে নতুন ছাতাটা দিও। ওকে কোনোদিন যেন রোদে পুড়তে না হয়, বৃষ্টিতেও যেন ভিজতে না হয়। ঘরে টাঙানো রামভক্ত হনুমানজীর ছবিটা কোনো ভিখারিকে দিয়ে দিও। কেননা পৃথিবীতে সততার দাম নেই। বিশ্বাসেরও মৃত্যু হয়েছে। আর শোনো, একটা সিগারেট খাচ্ছি। কিছু মনে কোরো না। আর হ্যাঁ, ঈশ্বরের যদি আদালত থাকে, সেখানে আপীল করবো, মানুষ হয়ে আর যেন জন্ম না হয়। মানুষ হয়ে মানুষকে খাওয়াটা বড় বোকা বোকা লাগে।"

খোকন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়তে-ছাড়তে চিঠিটাকে ভাঁজ করল। বাবাকে বাঁচানোর জন্য কম চেষ্টাও করা হয়নি। জমানো টাকা সবই শেষ হয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজনেরাও যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কিন্তু বাবার মৃত্যু হল। ভয়ে। কিন্তু ভয়টা কে দেখাল? অপরাধীর চিহ্নমাত্র নেই। খোকন বলল,

বাবা চিঠিটা জুন মাসের চার তারিখ লিখছিল।

হ্যাঁ, তোর বাবা জুন মাসের পাঁচ তারিখ সকালেই মারা যায়। প্রমীলা খোকনের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে ভাঁজ করল। নরহরির ভয়টাও হয়তো চিঠিটার সঙ্গে ভাঁজ হয়ে গেল। প্রমীলা বালিশের তলায় চিঠিটা রেখে দিল।

অনেক রাত। প্রায় দ্বিতীয় প্রহরও শেষ হয়ে গেল। বাকি রাতটুকু প্রমীলা বালিশের ওপর নয়, ঠিক যেন শহীদ বেদীতে মাথা রেখে ঘুমোবে।

বর্জ্য গ্রহ

তৃষ্ণা বসাক

যুদ্ধ বোধহয় আর ঠেকানো গেল না। অনেকদিন ধরেই ভেতরে ভেতরে ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল। ঠারেঠোরে কথা, নাম না করে বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি, তারপর হুমকি, হুঙ্কার, তর্জন-গর্জন, এরপরো অনেকে আশা করেছিল সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সম্মিলিত গ্রহসংঘের বৈঠক থেকে যখন লাল চাকতি আর নীল চাকতি—এই দুই গ্রহের গ্রহপতিরা মুখ কালো করে বেরিয়ে এলেন তখন সে আশাটুকুও নিভে গেল। গ্রহসংঘের প্রধান আনি-বানি-জানি না, যাঁকে আড়ালে সবাই ঘন্ট বলে ডাকে, কারণ যিনি যেকোন আলোচনাকে ঘন্ট পাকিয়ে সরল বিষয়কে জটিল করে তুলতে ওস্তাদ, তিনি ভিজে বেড়ালের মতো মুখ করে প্রেস মিটে বললেন 'আপনাদের কারো কাছে মাথা ধরার বাম আছে? বড্ড মাথা ধরেছে। যাই বাড়ি গিয়ে চাড্ডি গেঁড়ির ঝোল খেয়ে ঘুমোই' সব সৌরজগতের তাবড় তাবড় সাংবাদিকরা তো হাঁ। কিন্তু তারা এরপর হাজার চেষ্টা করেও আনি-বানি-জানি-না র মুখ থেকে একটা কথাও বার করতে পারল না। প্রেস মিট থেকে বেরিয়ে তিনি সোজা চলে গেলেন সাইপ্রাস সান্তারা নামের এক ছোট্ট গ্রহে ছুটি কাটাতে। ব্যস, ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে কী কী কথা হল, যুদ্ধ হবে কি হবে না তা সোজাসুজি জানার কোন উপায়ই রইল না। বাধ্য হয়ে কড়া নজর রাখা হল দুই গ্রহের ওপর। তারা কী বলছে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে কিনা, বিদেশি আসার ওপর কড়াকড়ি হচ্ছে কিনা এসব খুঁটিয়ে দেখা হতে লাগল। তার সেসবের ভিত্তিতেই মহাবিশ্বের আনাচে কানাচে ঘুরতে লাগল একটাই ফিসফিসিনি—যুদ্ধটা এবার হচ্ছেই।

অথচ খুবই সামান্য একটা ব্যাপার। ময়লার বালতি! ডাস্টবিন! গত ১০০ বছর ধরে লাল চাকতি, নীল চাকতি ও অন্যান্য গ্রহপুঞ্জের যে সমস্যাটি সব গ্রহপতিদের মাথাব্যাথার মুখ্য কারণ হয়ে আছে, তা হচ্ছে ময়লা কোথায় ফেলা হবে। এ ব্যাপারে পৌরাণিককালে বাড়ির গিন্নিরা যা করতেন, অর্থাৎ এদিক ওদিক তাকিয়ে চুপি চুপি রাস্তায় ফেলে দেওয়া, তাবড় তাবড় গ্রহগুলিও অবিকল তাই করত—সব বর্জ্য গোল্লা পাকিয়ে মহাকাশে ছুঁড়ে দেওয়া। আগেকার দিনে মহাকাশের রাস্তা প্রচুর ফাঁকা ছিল, এত নভোযান চলত না, প্রাইভেট স্পেসজেট তো ছিলই না, তখন এ নিয়ে খুব বেশি সমস্যা হয়নি, গোল্লা পাকানো ময়লা আরেকটা উপগ্রহের মতো গ্রহটির চারপাশে ঘুরতে থাকত। কিন্তু এখন মাটিতে চলা গাড়ির তুলনায় আকাশগাড়ি বেশি, প্রাইভেট স্পেসজেটের তো ছড়াছড়ি। আন্তঃগ্রহ চলাচল অনেক বেড়ে গেছে। আগেকার লোক যেমন চুঁচড়ো বা বনগাঁ থেকে কলকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করত, তেমনি এখন অনেক লোক পৃথিবী থেকে মঙ্গল বা চাঁদ থেকে নীল চাকতিতে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। আর তার ফলে সেই ময়লার গোল্লাগুলির সঙ্গে নিত্য কলিশন, দুর্ঘটনা। স্বচ্ছ গ্রহ নীতি, অনেক সচেতনতা অভিযান, হ্যানা ত্যানা করেও কিস্যু হল না। সবচেয়ে যেটা মুশকিল কোন গ্রহেই এতটুকু বাড়তি জায়গা পড়ে নেই যেখানে ময়লা ফেলা যায়। প্রাচীনকালে পৃথিবী গ্রহে কলকাতা নামক একটি জনপদ ছিল, সেখানে ধাপার মাঠ ছিল বিখ্যাত ময়লা ফেলার জায়গা। সরকারিভাবে সেখানে ময়লা ফেলার কথা, কিছু-কিছু ফেলাও হত, কিন্তু ইতিহাস বলছে পুরো জনপদটিই ছিল সম্প্রসারিত ধাপার মাঠ। ওখানকার বাসিন্দাদের নাকে কাপড় ঢেকে চলাফেরা অভ্যেস হয়ে গেছিল, তাই কলকাতাকে অনেকে ঢাকা বলে ভুল করত। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ঢাকা আবার কী? এটি আর একটি জনপদ, এর বেশি কিছু এই কাহিনীতে প্রাসঙ্গিক নয়। মোদ্দা কথা হল ধাপার মাঠ এখন একটি অসম্ভব রূপকথা। এখন কোন গ্রহেই ওই জায়গা ময়লা ফেলার জন্য বরাদ্দ করা সম্ভব নয়। বেশ কিছু বছর এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা, গোলটেবিল, দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক, বৈঠক ইত্যাদি চলবার পর অবশেষে সিদ্ধান্ত হল নিউ স্টার গ্রহাণুটা তো খালিই পড়ে আছে, ওতেই আপাতত ময়লা ফেলা যাক। অবশ্য সবাই নয়, আপাতত দুটি গ্রহ এখানে ময়লা ফেলতে পারবে,

ডিজিটাল সিলেকশনের মাধ্যমে গ্রহদুটির নাম ঠিক হল—লাল চাকতি আর নীল চাকতি। তাহলে বাকি গ্রহগুলো কি বানের জলে ভেসে এসেছে? এমন প্রশ্ন ওটা স্বাভাবিক, উঠলও। সম্মিলিত গ্রহসংঘ করজোড়ে জানালেন সব গ্রহের জন্যেই খালি গ্রহাণুর খোঁজ চলছে, দয়া করে একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। অপেক্ষা? তা কতদিন? সে ব্যাপারে সম্মিলিত গ্রহসংঘ কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না। দেবেন কীভাবে? খালি গ্রহাণু কোথায়? বেশিরভাগই কোন না কোন সরকারি কাজে লিজ নেওয়া আছে। কোনটা অস্ত্র কারখানা, কোনটা রিসর্ট, কোনটা ক্রেশ, কোনটা গণ বিনোদন কেন্দ্র। বাকি গুলো কোন না কোন গ্রহ জবরদখল করে বসে আছে। সে তবু ভাল। বাদবাকিগুলোর অবস্থা আরো খারাপ। সেখানে নানারকম গ্রহসংঘবিরোধী, অ-গ্রহসামাজিক কাজকর্ম চলে, এর পেছনে গ্রহসংঘের কয়েকজন কর্তাব্যক্তির প্রচ্ছন্ন মদত আছে বলে শোনা যায়। তাই সেসব গ্রহাণু খালি করা মোটেই সোজা কথা নয়, সর্ষের মধ্যেই যেখানে ভূত! আনি-বানি-জানি-না র এমন ফাঁকা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অন্য গ্রহগুলো কিন্তু, কি আশ্চর্য, বিশেষ চেঁচামেচি করল না। তার একটা কারণ হয়তো তারা দেখতে চাইছিল, এভাবে একটা গ্রহাণুতে ভাগাভাগি করে আবর্জনা ফেলার প্রকল্পটা সত্যি সত্যি সফল হয় কিনা। এছাড়া তারা সেই মুহূর্তে আর একটা মহাকাশযুদ্ধের দায় নিতে রাজি ছিল না।

প্রথমে ব্যাপারটা ভালোভাবেই শুরু হল। লাল চাকতি আর নীল চাকতি শান্তিপূর্ণভাবেই নিউস্টারে ময়লা ফেলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন কী হল, লাল চাকতির ময়লাগাড়িকে বাধা দেওয়া হল, ফিরিয়ে দেওয়া হল। মজার ব্যাপার যারা বাধা দিল তারা নিউ স্টার পুলিশ নয়, নীল চাকতির নাগরিকও নয়, একদল রোবো-মাফিয়া। এদের ভয় করে না এমন লোক এই ভু-চরাচরে নেই। এরা প্রথম দিন বাধা দেবে, দ্বিতীয় দিন লোপাট করে দেবে। এমন প্রোগ্রামড। তাদের বাধা পেয়ে ময়লা ভ্যান পত্রপাঠ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এল। রেগে আগুন হয়ে গেলেন লাল চাকতির গ্রহপতি রক্তিম লালা। এটা পরিষ্কার যে নীল চাকতি ওই রোবোগুলোকে সুপারি দিয়েছে। পুরো নিউ স্টারকে তারা একাই দখল করতে চায়। ময়লা টয়লা সব বাজে কথা ওরা এখানে একটা বেআইনি অস্ত্র কারখানা খুলতে চায়। ঠারেঠোরে নয়, একেবারে অল প্ল্যানেটস প্রেস মিট ডেকে নাম করেই তিনি অভিযোগ আনলেন নীল চাকতির বিরুদ্ধে।

ব্যস! আগুনে একেবারে ঘি পড়ল। ঘি শব্দটা বুঝতে অবশ্য এখনকার বাচ্চাদের অসুবিধে হবে। আমি বলি কি, একবার কুকিং আরকাইভগুলো ঘুরে দেখো, তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবে কাকে বলে ঘি। রেসট্রিকটেড প্লেস ছাড়া আগুনও সবজায়গায় দেখা যায় না। যাইহোক আগুনে ঘি যখন পুরাকালে পড়ত, তখন যেমন দাউদাউ করে জ্বলে উঠত, লাল চাকতির বিবৃতি শুনে নীল চাকতির গ্রহপতি সুনীল ব্লুম তেমনি জ্বলে উঠলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মানহানির মামলা ঠুকে দিতেন যদি না সেই মুহূর্তে তাঁর স্ত্রী পাশ থেকে মনে করিয়ে দিতেন হপ্তায় হপ্তায় তিনি লাল চাকতিতে বডি স্পা করাতে যান, ওখানে রেটটা সস্তা, পরিষেবাও ভালো। এসব মামলা টামলা বাধলে মাঝখান থেকে তাঁর স্পা করানো বন্ধ হয়ে যাবে। নিরাপত্তার অজুহাত দিয়ে সুনীল তাঁকে কিছুতেই লাল চাকতিতে যেতে দেবেন না। আসল ব্যাপারটা অন্য। সেটা নীলিমা ব্লুম মানে সুনীলের স্ত্রীর ওই নাম, তিনি ছাড়া কে জানবে। সুনীল হচ্ছেন মহাকিপটে। যেকোনো অজুহাতে তিনি বৌ-বাচ্চার খরচ কাটছাঁট করতে চান। শুধু কি স্পা, তাঁদের বড় ছেলে নীলাম্বর প্রাইভেট টিউশনও তো ওই লাল চাকতিতে। আসলে অস্বীকার করে লাভ নেই, নীল চাকতি এখনো একটা উন্নয়নশীল গ্রহ। আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় প্রায় কিছুই সেখানে মেলে না। হায়ার স্টাডিজ তো দূরের কথা, স্কুলিংও বেশিরভাগ সময় অন্য গ্রহে করতে হয়। চাকরি বাকরির তেমন কোন সুযোগ নেই। আশ্চর্য কি, বেশিরভাগ ছেলেপিলে বখাটে মেরে যাচ্ছে। নীলিমার খুব মনে হচ্ছিল, সুনীল যতই রাগ দেখান, নিউ স্টারে গন্ডগোল তিনিই বাধিয়েছেন, ওখানে বেআইনি অস্ত্র কারখানা থাকার কথা তিনি বিলক্ষণ জানেন। জেনে চুপ করে আছেন কারণ এতগুলো বেকার ছেলেকে চাকরি দিতে পারার ক্ষমতা তাঁর নেই বলে। নীলিমা গম্ভীর মুখে ন্যানো ব্রাশ দিয়ে নখে নখপালিশ লাগাতে লাগাতে বললেন 'খবরদার অমন কাঁচা কাজ করো না। আমার স্পা বা নীলুর টিউশন না হয় ছেড়ে দাও, আমাদের কাঁচা বাজারও তো লাল মেগা মার্ট থেকে হয়। ওখানকার শ্যাওলার চচ্চড়ি দিয়েই তো তুমি একথালা ভাত খাও গো'।

২

আবেদনের পর আবেদনে সম্মিলিত গ্রহপুঞ্জর ডেস্ক ভরে উঠেছে। অনেকদিন ঘাপটি মেরে থাকার পর একটু শান্ত পরিবেশ দেখে আনি-বানি-জানি-না অজ্ঞাতবাস ছেড়ে দপ্তরে ফিরেছেন। আসলে তিনি গিয়েছিলেন সাইপ্রাস সান্তারার এক বিলাসবহুল রিসর্টে। এসেই চিঠির স্তূপ দেখে তো তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। প্রথমে আঁতকেই উঠেছিলেন। এত দামী কাগজ নষ্ট করে চিঠি লিখেছে সবাই! এখনকার দিনে কাগজ নষ্ট করা এক গর্হিত অপরাধ। কিন্তু এতজন মিলে অপরাধ করলে কীভাবে শাস্তি দেওয়া যাবে, তা ভাবতেই তাঁর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।

আজকাল কাজের নামে গায়ে জ্বর আসে আনির। ইচ্ছে হয় লুনাটিক রিসর্টে জলের ধারে শুয়ে শুয়ে পুরোনো পুঁথিপত্র পড়েন আর হরিদাসের বুলবুলভাজা খান। হরিদাসের বুলবুলভাজা বলে যে বস্তুটি চাঁদে বিক্রি হয়, সেটি আদপে সেই খাঁটি বুলবুলভাজা নয় যদিও। তবে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে তাঁর? যাই হোক একটি চিঠি চোখের সামনে তুলে ধরে তিনি দেখলেন না, কাগজ নয়, কৃত্রিম তন্তু, দেখতে অবকিল কাগজ যদিও। তাঁর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। যাক কাউকে সাজা-টাজা দিতে হবে না। কিন্তু এত চিঠি বসে বসে পড়তে হবে নাকি? সে কাগজটিও সহজ করে দিল তাঁর দক্ষ সচিব কুমারী চটপটা। সে মিষ্টি হেসে জানাল যে সব স্ক্যান করে রেখে দিয়েছে। সব চিঠিই এসেছে লাল চাকতি ও নীল চাকতির সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে। তাদের বক্তব্য প্রায় এক। এ বছর তাদের বর্ষা মকুব করতে হবে। কারণ নিউ স্টার সিল করে দেওয়ায় কেউ আর ময়লা সেখানে ফেলতে পারছে না। সব যে যার বাড়ির সামনেই জমা করছে। এ অবস্থায় বৃষ্টির কল চালালে কী যে বিশ্রী ব্যাপার হবে .... ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিজের ঘরের দোলনা চেয়ারে দুলতে দুলতে হেসে বাঁচেন না আনি-বানি-জানি-না। কী একটা কাজে বসের ঘরে ঢুকে রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন কুমারী চটপটা। 'দিব্যি ছিলেন খোসমেজাজে চেয়ারখানি চেপে / একলা বসে ঝিমঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে।'

ব্যাপারখানা কি? স্যারের মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? চটপটাকে অমন অবাক চোখে চেয়ে থাকতে দেখে আনি-বানি-জানি-না দুলুনি থামিয়ে বললেন, 'কেসটা কী বলো তো? ফি বছর একস্ট্রা রেন অ্যালাউন্স চেয়ে চিঠি আসে, বর্ষা উৎসব, বর্ষা মেলা, উদ্বোধন করতে করতে হাঁপিয়ে যাই, এবার হলটা কী?'

'আজ্ঞে স্যার' বলে স্ক্যান করা চিঠির বক্তব্য আবার গড়গড় করে বলতে শুরু করে চটপটা। এতক্ষণে কানে কিছু ঢোকে আনি-বানি-জানি-না র। লাল চাকতি, নীল চাকতি, নিউ স্টার, ময়লা ফেলা শব্দগুলো শুনতে শুনতে তিনি খাড়া হয়ে বসেন, তারপর চেয়ার ছেড়ে ঘরে পায়চারি করতে শুরু করে দেন। উঃ ফির ওহি পুরানা মুসিবত। কোথায় তাঁর অনুপস্থিতিতে আপনাআপনি সব মিটমাট হয়ে যাবে, তা না আরো ঘোঁট যে পাকিয়েছে, তা চটপটার কথা থেকে পরিস্কার। নিমপাতার মতো মুখে ফাইলপত্র ঘাঁটতে শুরু করেন আনি-বানি-জানি-না। তারপর গম্ভীরমুখে বলেন 'নীল চাকতি তো দেখছি বেমালুম সব অস্বীকার করেছে। বলছে ওরা কোন লোক পাঠায়নি'।

'হ্যাঁ স্যার কথাটা মিথ্যে নয়। নীল চাকতির লোকও ময়লা ফেলতে গিয়ে একইরকম বাধা পেয়েছে' আনি-বানি জানি না বলেন 'হুম। ইন্টারেস্টিং। তা কারা এ কাজ করছে কিছু জানা গেছে?'

কুমারী চটপটা জরুরি পয়েন্টস ভুলে না যাওয়ার জন্যে চিরকুটে লিখে রাখে। সে তার জামার পকেট থেকে তেমন একটা চিরকুট বার করে বলল 'তেমন কিছু না স্যার। নিউ স্টার সিল করে দেওয়ায় আর কিছু জানা যাচ্ছে না। তবে ইন্টারস্পেসপোল নিজেদের মতো করে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ওঃ' হঠাৎ ঝলমল করে ওঠে চটপটার মুখ। সেটা চোখ এড়ায় না আনি-বানি-জানি-না র।

'কী হল? এত উৎফুল্ল হবার কী কারণ ঘটল হঠাৎ?'

'স্যার। মনে পড়েছে। আজই তো ইন্টারস্পেসপোলের প্রথম কিস্তির রিপোর্ট সাবমিট করার কথা।'

'কোথায়? এখানে আসবে না তো? আঁতকে ওঠেন আনি। সবে ছুটি থেকে ফিরে হাজার ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, ভিড়ভাট্টা ভাবতেই শিউরে ওঠেন তিনি।

চটপটা তাঁকে আশ্বস্ত করে বলে 'ডোন্ট ওরি স্যার। স্পেস কমিউনিটি সেন্টারে হবে ব্যাপারটা। দাঁড়ান, ওয়ালনেট চালিয়ে দিচ্ছি। সরাসরি দেখানোর কথা।'

বলেই সামনের দেওয়ালে আঙুল ছোঁয় চটপটা, আর অমনি চালু হয়ে যায় টাচ স্ক্রিন ওয়ালনেট। ইন্টারস্পেস পোলের অধিকর্তা পোল্যান্ডো গম্ভীর মুখে হাতে ধরা নথি থেকে পড়তে থাকেন 'আপনারা শুনে খুশি হবেন নিউ স্টারে গন্ডগোলের পান্ডারা ধরা পড়েছে। সুখের এবং স্বস্তির কথা এরা কেউ নীল বা লাল চাকতির লোক নয়। কিন্তু এই বা অন্য সৌরজগতের কোন গ্রহেরও এরা বাসিন্দা নয়'। এই পর্যন্ত বলে পোল্যান্ডো একটু থামলেন। কমিউনিটি সেন্টার জুড়ে ফিসফিসিনি শুরু হয়ে গেল। তাহলে এরা কারা? পোল্যান্ডো কি কোন আষাঢ়ে গল্প শোনাতে সবাইকে এখানে ডেকেছেন? রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা ভেঙে আবার পড়তে শুরু করেন পোল্যান্ডো। 'এটা কোন মামুলি অপরাধের ঘটনা নয়। এ একটা দেশ গ্রহ এমনকি কালের সীমানা লংঘন করা চক্রান্ত।'

'মানে?' এবার আনি-বানি-জানি-না উঠে দাঁড়ান উত্তেজনায়। পোল্যান্ডো বলে যান 'যাদের আপনারা রোবো মাফিয়া বলে জানেন তারা কেউ রোবো নয়, এরা প্রাচীন মানুষ হোমো স্যাপিয়েনস, যারা পৃথিবী নামক গ্রহটিতে থাকত। আরো বিশদে বললে এরা ছিল ভারতবর্ষ নামের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের

বাসিন্দা। এদের সময় ভারত সাফাই অভিযান চালু হয়েছিল, গ্রামের রাস্তা ঘাট টয়লেট ইত্যাদি পরিষ্কার রাখার ডাক দিয়ে। কয়েকটি গ্রামের মোড়ল তাতে কর্ণপাত করেনি। সর্বকালে সর্বযুগেই এরা আছে। নোংরার মধ্যে এরা ভালো থাকে, পরিষ্কার হাওয়ায় এদের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।'

হঠাৎ একটি কচি কণ্ঠে প্রশ্ন শোনা যায় 'এরা কি তাহলে ভূত?'

পোল্যান্ডো হেসে বলেন, 'ভূত মানে যদি অতীত হয়, তা হলে এরা ভূত। আসলে তিন হাজার বছর আগে থেকেই প্রতি মুহূর্তের টাইম-মিরর ইমেজ তুলে রাখার ব্যবস্থা চালু হয়। ব্যক্তিগত ক্যামেরায় তো বটেই, রাষ্ট্রের উদ্যোগেও। এই ইমেজ থেকে এরা অনেকসময় সময় সীমান্ত পার হয়ে চলে আসে। এরা যেমন এসেছে।'

বৈঠক শেষ। ওয়ালনেটে দেখা গেল রক্তিম লালা আর সুনীল বুমের উষ্ণ করমর্দনের ছবি। পেছনে একঝলক নীলিমাকেও দেখা গেল, মুখে চওড়া হাসি। স্বাভাবিক। লাল চাকতির স্পাতে যেতে কোন বাধা রইল না, স্বামীর পাতে রোজ শ্যাওলার চচ্চড়িও তুলে দিতে পারবেন আগের মতো। আনি-বানি-জানি-নারও তো খুশি হওয়া উচিত, দুই গ্রহের ঝামেলা মেটানোর কাজ ঘাড় থেকে নামল। তাঁর স্বপ্নের বর্জ্য গ্রহ প্রকল্পের প্রাথমিক ধাপ সফল। এখন তাঁর আবার অখণ্ড অবসর। চাঁদে গিয়ে হরিদাসের বুলবুল ভাজা খেতে পারবেন ইচ্ছেমতো। কিন্তু খুশি হতে পারছেন কই? তাঁর ঘাড়ের কাছে কারা যেন ভেজা ভেজা নিঃশ্বাস ফেলছে। একবার যখন সময়-সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে, এত সহজে ওরা ফেরত যাবে না। আর কী কী দুর্ভোগ কপালে লেখা আছে কে জানে। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস পড়ে আনি-বানি-জানি-নার।

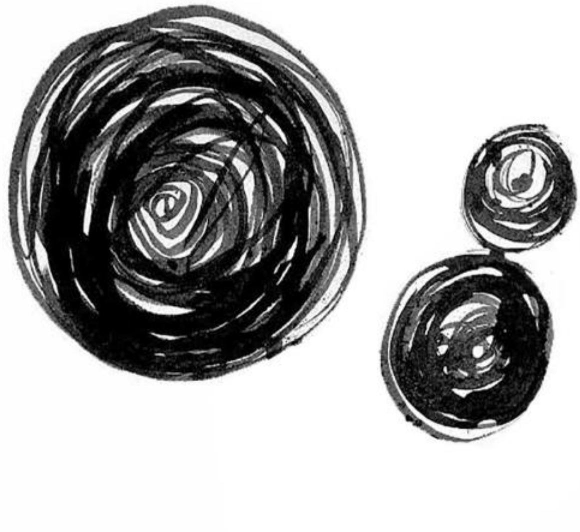

ডাস্টবিন

ঝুমুর পাণ্ডে

পেঁচাটা ডাকছে নিম। নিম। নিম।

ছেঁড়া তুলো বের হওয়া ডাস্টবিন তোষকে পাশ ফিরল অমিতা রাণী। পেঁচাটা বোধ হয় ওই কৃষ্ণচূড়ার গাছটাতে বসে ডাকছে না ওই যজ্ঞ ডুমুরের গাছটাতে কে জানে? আছে তো এখানে বেশ কয়েকটাই গাছ। গত ঝড়ে জড় সহ উল্টে পড়ল বটগাছটা আহারে! দেখে বড় কষ্ট হয়েছিল অমিতা রাণীর। কত পাখ-পাখালি বাসা বাড়ি ঘর-সংসার ছিল এই গাছটিতে হায়রে .... পেঁচাটা এখন বিড়ালের মতো ডাকছে। আগে এই নিম পেঁচা ডাকলে সুখদা মাসি বড় ভয় পেত। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলত কু ডাক রে কু ডাক। কার যে সর্বনাশ হইব। পেঁচাকে ভাগাবার জন্য হলুদ দিত চুলোয়। যা। যা। যা। আবার পাশ ফিরল অমিতা রাণী। কার বাড়িতে ঢোলক বাজিয়ে বিয়ের গান গাইছে মেয়েরা ....

ঢুল বাজে আকাশে
দুতারা বাজে দামাদর বাসরে
মৃদঙ্গ বাজে দামদর নবীন শ্বশুর দেশেতে
কে একজন সঙ্গে এখন দোতরা ও বাজাচ্ছে ....
আমার দামাদ বড় হাউসিয়া
আয়না কাকই আনদইন দামাদে বাছিয়া
আমার দামাদ বড় হাউসিয়া
চুলের ফিতা আনদইন দামাদে বাছিয়া
নাকের নুলুক আনদইন দামাদে সুন্দরীর লাগিয়া ....

আবার পাশ ফিরল অমিতা রাণী। ভাঙা টিনের দরজা দিয়ে এখন বরাক নদীর হিমেল বাতাস হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। অমিতা রাণীর ছয় বাই চার হাতের ঘরটাতে। ঘরটার অ্যাসবেসটারের ছাদে কতটা যে ফোকর। গেলবার অভয়তারিণী পুজো কমিটির ব্যানারটা রাস্তায় পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে দেখে তুলে এনেছিল অমিতা রাণী। ঘুঘনিওয়ালা রতীশকে বলে কয়ে ভাই দাদা ডেকে ওই ব্যানারটা দিয়ে চালের ফুটোটা ঢেকেছে ইঁটচাপা দিয়ে। তবু বাঁদিকের ফুটোটা দিয়ে এখনও বৃষ্টি হলে গদ গদ করে জল পড়ে। ভিজে যায় বিছানা সব জিনিসপত্র। থালা বাটি তখন সব পেতে দেয় অমিতা রাণী। পড় কত পড়বি। পড়। পড়। আর এই ঘরের জন্যই মাসে পাঁচশ টাকা গুনতে হয় অমিতা রাণীকে। ভাঙাচোরা তো কি? বললেও ঠিক করিয়ে দেয় না। ওই তো পাশেই থাকে মালিকনী সবিতা রাণী। আজ মেয়ের অধিবাস। কিন্তু একবারও ডাকল না অমিতা রাণীকে। ঝগড়া তো কি? কাল ওই জল নিয়ে ঝগড়া হল। মাস খানেক হল নিজের উঠোনে জলের কানেকশন নিয়েছে। কিন্তু ভাড়াটে কাউকে জল নিতে দেয় না। বলে রাস্তা থেকে আনো। কিন্তু রাস্তায় এত লম্বা লাইন যে জল পেতে হলে সকালের দুবাড়ির কাজই বাদ পড়ে যাবে। তাই কাল এল্যুমিনিয়ামের কলসিটা পেতে দিল অমিতা রাণী। তখনও জল আসেনি।

সরা তোর কলস।

এক কলসই তো লইমু।

কইসি সরা। নাইলে লাথ মারিয়া ফালায় দিমু।

কিতা কইলায় লাথ মারবায়? মারও দেখি লাথ। অমিতা রাণীও কম যায় না।

তোর সাহস কেমনে হইল। এখন বাইর হো আমার ঘর থাকিয়া।

তোর ঘরও এমনে থাকিনি বেটি ভাড়া দিয়া থাকি। হল্লা শুনে সব ভাড়াটেরা বের হয়ে এসেছিল। এসেছিল ঘুঘনিওয়ালা রতীশও।

কিতা কইলে আটুকুড়ি ছিনাল বেটি। এর লগি জামাই-এ ছাড়িয়া গেসে।

কিতা কইলে? আবার কসাইন। আবার ক।

কিতা করবে তুই? কিতা করবে?

অনেক মানুষ জমে গিয়েছিল। শেষে রতীশের বউ অমিতা রাণীকে টেনে না নিয়ে এলে যে কি ঘটত কে জানে। নির্ঘাত

মারামারি হত। কাল তো রাস্তার কলে একটা মারামারির ঘটনা ঘটেই গেল। সুদামের মেয়ের মাথা ফাটিয়ে দিল রতনের মা।

পেঁচাটা আবার ডাকছে। ডাকুক। আবার পাশ ফিরল অমিতা রাণী। চালের ফোকর দিয়ে এখন চাঁদের আলো ঢুকছে ওর ছোট্ট ঘরে। চারদিক জিনিসে ভরা। কি নেই, সমীর বাবুদের ফেলে দেওয়া সব জিনিসই এনে ঘরে ভরে অমিতা রাণী। ভাঙা চেয়ার, ছেঁড়া পাপোষ, ভাঙা বালতি, জঙ লাগা ছুরি, ছেঁড়া বিছানার চাদর, তোষক, লেপ, কম্বল, শিশি বোতল, এমনকি ফেলে দেওয়া পুরোনো লিপস্টিক, শুকিয়ে যাওয়া নেল পালিশের শিশি, ক্লিনজার, বডিওয়েলের শিশি সব এনে জড়ো করে অমিতা রাণি। সমীরবাবুর মেয়ে তাই ওকে নাম দিয়েছে ডাস্টবিন। এখন আর ওদের কষ্ট করে নিয়ে রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলতে হয় না কিছু। জীবন্ত ডাস্টবিনই সব কিছু বহন করে, ধারণ করে, করে লালনও। এমনকি ফ্রিজে রাখা নষ্ট হয়ে যাওয়া তরিতরকারি, রান্না তরকারি খারাপ হয়ে যাওয়া সব কিছু। সমীরবাবুর কলেজে পড়া মেয়েটা যখন অল্প খেয়েই উঠে পড়ে। থালায় পড়ে থাকে যত সুস্বাদু খাবার মা বলে— ফেললি কেন এত কষ্ট করে বানালাম—মেয়েটা তখন হি হি করে হাসে। ডাস্টবিন আছে না! আর অমিতা রাণীরও কোন ঘেন্না পিত্তি নেই। সব কিছু ধারণ করে। হ্যাঁ সব কিছু। ...

আবার পাশ ফিরল অমিতা রাণী। এখন একটা রাতজাগা পাখি ডাকছে ঝি উঠ। বউ উঠ। ঝি উঠ .... মালিকনী সবিতা রাণীর ঘরেও অধিবাসের ধামাইল দিচ্ছে মেয়ে বউরা—

কুঞ্জ সাজাও গিয়া
সব সখি মিলিয়া
এগো মনো রঙে সাজাও কুঞ্জ
হরষিত হইয়া ....

এখন কোন রাত জাগা পাখি যেন উলু দিচ্ছে। জেগে থাকলে কত রকম শব্দ যে কানে আসে। রাতটাকে কখনও বীভৎস আবার কখনও বড় মায়াময় মনে হয় অমিতা রাণীর। ছেড়ে যাওয়া স্বামীটা মাঝে মাঝে আসে। ওই ওর এখনকার বছর বিয়ানী বউটার যখন প্রসব হয়। শরীর খারাপ হয়। তখন বাঁজা অমিতা রাণীর শরীরটার দরকার পড়ে স্বামীটার। তখন এসে ভাল ভাল কথাও বলে। আর অমিতা রাণী কি করবে ওরও শরীর তো কোন শরীর চায়। তখন তাই আহ্লাদে গলে যায় অমিতা রাণী। আর শরীর ছেড়ে উঠে ওই স্বামীটা যখন অমিতা রাণীর কষ্ট করে জমানো পয়সাগুলো নিয়ে যায়। তখন কিছুই বলতে পারে না অমিতা রাণী। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। ঘুঘনিওয়ালা রতীশ এসে বোধহয় এখন হল্লা করছে। রোজ রাতে মদ খেয়ে এসে হল্লা করে অথচ দিনে বেশ ভাল মানুষ। অমিতা রাণীকে যখন তখন অনেক কাজে কামে সাহায্যও করে। একটা রিক্সা গেল টুনটুন করে। নিশ্চয় এটা লক্ষণ, লক্ষণই এমন রাতে ফেরে। আবার পাশ ফিরল অমিতা রাণী। চারপাঁচটা ঘরে কাজ করে শরীরে ব্যাথা হয়ে যায়। আজ একজন নতুন ব্যাঙ্কের বাবুর ঘরে কাজ নিয়েছে। কিন্তু ওর নাম অমিতা রাণী শুনে ওর বউ হেসে কুটি কুটি হল। এতে হাসার কি আছে? সমীরবাবুর বোনের নামও তো অমিতা। শেষে হাসির কারণ বুঝতে পারল ওরা নাকি পেঁপেকে অমিতা বলে। যাক্‌গে, একটা ট্রেনের শব্দ, বোধহয় স্টেশনে ঢুকছে। না, ঘুমটা কেন যে আসছে না। পেঁচাটা আবার ডাকছে। ওদিকে আবার কে কানছে। ডাক। ডাক। ডাকরে পেঁচা আমার আর কিতা কু হইব? হাই তুলল অমিতা রাণী। ওদিকে আবার গান হচ্ছে—

জাগো রে কৌশল্যা নন্দন
অধিবাসের সময় বহিয়া যায় ...

অনেক পাখ-পাখালি ডাকছে। তার মানে কি ভোর হয়ে যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়েছিল কি! চারদিকে তাকায় অমিতা রাণী। ভাঙা চোড়া ডাস্টবিনের ভেতর শুয়ে আছে আরেক ডাস্টবিন। সমীরবাবুর মেয়ে ঠিকই বলে ওকে ডাস্টবিন। টিনের দরজাটা এতভোরে কে ধাক্কা মারছে। উঠে বসল অমিতা রাণী। টিনের ভাঙা দরজা এমনি খুলে গেল। এমা একি সমীরবাবুর বউ এত ভোরে? হাতে একটা ঘুমন্ত জ্যান্ত পুতুল ফ্লানেল দিয়ে মোড়া।

নে। ধর। ধর।

আবার ট্রেনের শব্দ।

জানিস তো মেয়েটার সামনের মাসে বিয়ে। ছেলে আমেরিকায় থাকে। এর মধ্যে মেয়েটা এক বন্ধুর সঙ্গে এনজয় করতে গিয়ে বাধিয়ে বসল, কি করি বল? এত পরে ব্যাপারটা জানতে পারলাম যে করার কিছু ছিল না।

অমিতা রাণী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।

অনাথ আশ্রমে দিলেও নাম ধাম সে আরেক হ্যাপা।

ডাস্টবিনে ফেললেও ....

জ্যান্ত ডাস্টবিন অমিতা রাণী এখন কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল ....

সবিতা রাণীর ঘরে এখনও গান হচ্ছে—

আর তো নিশি নাইগো সখি
আর তো নিশি নাই
এগো আইল না আইল না কুঞ্জে
রঙ্গিলা কানাই ....

সঙ

তন্বী হালদার

(১)

আয়ানের খোকাটাকে দড়ির দোলনায় দোল দিতি দিতি কৃষ্ণের খুব বিড়ির তেষ্টা পায়। কিন্তু কচি ছেলের সামনে ফুঁক ফুঁক করি ধোঁয়া ছাড়া মোট্টে ভালো কথা নয়। কৃষ্ণের মনে অনেক চিন্তা। এবার দোলে খুব বেশি বায়না হয়নি তাদের। গেল বারেও ফাল্গুন, চৈত্র দুটো মাস ধরে ফি দিনই বায়না ছিল। দম ফেলার ফুরসৎ ছিল না। অবশ্যি এজন্যি কৃষ্ণ মনে মনে বেশ খুশিই। ঐ টুকুন ছেলেডারে নে এ প্রান্তর ও প্রান্তর করি বেড়ালে বাছার শরীল টিকতোনি। আয়ানের বৌ বাচ্চা বিইয়ে সাড়ে তিন মাসে ভেগে গেছে। উফ বাপরে বাপ তারপর থেকি কি সেগোপ্তো। বাছা তো বুকের দুধের নেশায় টাস দে কাঁদে, আর আয়ান বিড়ির খোলে গাঁজার পুরিয়া ভরে দম দে এ জগৎসংসার থেকি ভোঁকাট্টা হয়ি আছে। রাধুটা তো জন্মহারামী। এদ্দিন দলের সুঙ্গি আছে, অথচ কারও প্রতি কোনো টান নেইকো। সত্যভামা, রুক্মিণী, বিশাখা, ললিতা যখন যাকে পাচ্ছে তার সুঙ্গি ঢলাঢলিতে মেতি আছে। আর ওরাও হয়েছে তেমন 'রাধুদা' বলতি অজ্ঞান। শয়তান। মনে মনে চার অক্ষরের একটা খিস্তি দেয় কৃষ্ণ। যত জ্বালা হয়েছে এই কৃষ্ণের। দু'বেলা পাত পেরে সব কি গিলবে, তার থেকি কোথায় কখন কি পালার বায়না হবে সব হিসেব রাখতি হয় তাকে। এখন অবশ্যি আয়ানের এই ছোট্ট ছেলেডা সব সময় তার বুক জুড়ি আছে। কৃষ্ণ ওর নাম রেখেছে সুদর্শন। তবে আদর করবার সময় 'লাট্টু' বলেই ডাকে। তা সে লাট্টুর মা ভেগে যাওয়ার পর আয়ান ঠিক করেছিল, বেড়ালের বাচ্চার মতো কোথাও একটা ফেলে দে আসবে। তখন রুখে দাঁড়িয়ে ছিল এই কৃষ্ণই। মঞ্চে যেমন করে কালীয় নাগের মাথায় চেপি তাকে বধ করে, তেমনি করে আয়ানের টুটি চেপি ধরেছিল। গর্জে উঠেছিল, 'খপরদার আমার জান থাকতি এ কম্মর কথা ভেবেছিস তো জ্যান্ত পুঁতি ফেলবানে'। মঞ্চের ওপর এক মাথা কোঁচকানো ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে কৃষ্ণ যেমন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করে সেদিন তেমন ভাবেই সে অবতীর্ণ হয়।

এ দলের হেড হচ্ছে কংস। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরি তার শরীরের নানা ব্যামোর জন্যি সে খাবি খেয়ে যাচ্ছে। ওর মাথাতেই প্রথম আসে দলে অন্তত একডা ফিমেল থাকা দরকার। নারকেল মালার ওপর ব্রেসিয়ার পরে মেয়ে মানষের ঠমক এখন আর পাবলিক খায় না। রাধুর সঙ্গি সে নিয়ে প্রচুর ফাইটিংও হয়েছে। আর তখনই আয়ান শালা একডা ধেড়ে ছুড়ীকে কোত্থেকে নে এসে বলে, 'গাঁ থেকি নে আলাম গো। আমার বৌ। বে করেছি মন্দিরতলার কালীমন্দিরে। ধম্মস্বাক্ষী মেনি। নেও ইবার পড়েপিটে নাও।' এত খচ্চর একিবারে বৌ করি নে আলে যাতে আর কেউ হাত না বাড়াতি পারে। তবে একদিন ঐ বে'র জন্যি জব্বর খাওয়া দাওয়া হয়িছিল। কেন জানি কৃষ্ণের প্রেথম দিনই মনে হয়িছিল, 'এ মাল জাত সরেস, এর মাল টিঁকবে নি'।

আয়ানের বৌটা প্রেথম থেকিই কংসের গা ঘেঁষা ছিল। পূর্ণিমা, অমাবস্যায় ইছামতীর জলের সুঙ্গি পাল্লা দে যখন কংসের বাতের ব্যথায় পা ফুলে থোড় হত তখন সরষের তেল,

কালোজিরে রসুন দে গরম করি নে এসে কি সোহাগ, 'কৈ গো কংসদা দেও দেখি পা দু'খানা এট্টুস সেবা করি দিই'। শয়তানি। আস্ত শয়তানি। কৃষ্ণের তো মধ্যি মধ্যি সন্দেহ হয় 'লাট্টুর আসল বাপ কংস নয় তো।' পরক্ষণেই জীভ কাটে সে। ছি ছি এসপ কি ভাবছে সে। পাপ, পাপ ঢুকেছে তার মনে। কথায় তো বলে, 'জন্ম হোক যথা তথা কম্ম হোক ভালো'। লাট্টুকে বুকের মধ্যি তুলে নেয় কৃষ্ণ। সেই লাট্টুর পালক পিতা। লাট্টু তো তার 'সুর্দশন'। যে সুদর্শন দে ভগবান কৃষ্ণ কত পাপীর বিনাশ করিছে এ হল তার সেই 'সুদর্শন'। লাট্টুর কপালে চুমো দেয় কৃষ্ণ। দু' ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ে লাট্টুর গালে। আর তখনই নজরে আসে আয়ান এই সক্কাল বেলাই চাড্ডি মদ গিলে বাওয়াল করছে উঠোনের ওপাশের নিম গাছতলায়। তাকে ঘিরে শুধু রাধু, সত্যভামা, রুক্মিণী, বিশাখা, ললিতা না, বড়ো জিরাকপুর গাঁয়ের মানুষদেরও বেশ জমজমাট ভীড়। বিনি পয়সায় তামাসা দেখছে সক্কলে। কৃষ্ণের মনে হয় সেখানে গে আয়ানের মুখি দুই লাথ কষায়। রাধুটা চীৎকার করি ওঠে, 'ও কেষ্টাদা বসি বসি খালি লাট্টুর মুতির কাঁথা বদলালে হবে? এসোগো এখানে। আয়ান আমাদের কি সুন্দর গান বেঁধিছে দেখো'। বলে নিজেই হেঁড়ে গলায় বেখাপ্পা সুর করি গাইতে থাকে, 'লাট্টু বাবু যায় / ইদিক উদিক চায় / কংস আর আয়ান ভেবি মরে / বাপ কেডা হয়'। কৃষ্ণ আর সহ্য করতি পারে না। লাট্টুকে ঝপাং করি দোলনায় ফেলি দাওয়ার পাশে পড়ে থাকা একডা ছোটোপানা বাঁশ ঘাড়ে করি নে ছুট্টে যায়। কৃষ্ণকে ঐ ভাবে তেড়ে খিঁচে আসতে দেখি ভীড়টা পাতলা হয়ি যায়। বিশাখা এসে বাঁশ চেপি ধরে। বলে, 'করছিস কি কেষ্টাদা? মাথা খারাপ হয়ি গেল নাকি? এক্ষুনি একডা খুন-খারাপি হয়ি গেলে সারা জেবন জেলের ঘানি টানতি হবে, নইলি ফাঁসীতে লটকাতি হবানে। ছেলে মানুষ করা তখন পোঁদে ঢুকি যাবানে।'

(২)

এ দলটার সুঙ্গি কৃষ্ণ তা নাই নাই করি পাঁচ বছর হল জুতে গেছে। না কোনো দুঃখ কষ্টে সে ঘর ছাড়েনি। স্রেফ মন বসতোনি। ইছামতী নদীর ওপারে সংগ্রামপুরের ঘাট পেরিয়ে শিবহাটি গ্রামের জুনিয়ার হাইস্কুলটায় বাপের রাম ঠ্যাঙানির ভয়ে এইট কেলাস অব্দি ঘষটেছেও। কিন্তু যেই মাত্র নাইন ক্লাসে তাকে বসিরহাট পড়তে চালান করা হবে বলে বাড়িতে রব উঠলো তখনই কৃষ্ণের অন্তরাত্মা দমে বিদ্রোহ জানালো। না আর নয়। এক ভোর রাতে ক'টা জামাকাপড় আর ঠাকুমার লক্ষ্মীর ঘটখানা নে নিরুদ্দেশে পাড়ি জমালো কৃষ্ণ। বাপ-মায়ের বুক ফাটা হাহাকার একটুও কানে বাজে নি তার। বরং অনেক বেশি করে বেজেছিল রেল গাড়ির বাঁশী। আহা সে যেন ছিল সত্যিকারের কৃষ্ণ ঠাকুরের মুরলী। ঘুরতে ঘুরতে সে কেমনি করি বীরভুমের লাভপুরে এসি পৌঁছেছিল, সে বেত্তান্ত নিতান্তই সাদামাটা। সেখানে এক বহুরূপীর দলের সঙ্গে ভিড়ে গে পথে পথে ভিক্ষে করি বেড়াতো। নীল রঙ মাখিয়ে, মাথায় ময়ূরের পালক গুঁজি তাকে সত্য সত্যই কেষ্ট ঠাকুরের মতো দেখাতো। কিন্তু গাং-বিলের দেশের জলের পোকার মতো যে আজন্ম বড়ো হয়েছে, এপার ওপার দেখা যায় না যে নদীকে বুকে নে যে কিশোর হয়, তার কি কখনও ঐ রাঢ় দেশের টাড় অঞ্চলের রুক্ষ প্রকৃতি ভালো লাগে? এক বছরেই হাঁপিয়ে উঠেছিল মন। ইছামতী নদীটা শয়নে, জাগরনে তাকে ডাকতো। ঐ বহুরূপীর দলের মাথা লোকটার স্বভাব চরিত্তিরও ভালো ছিল না। ফাঁক পেলেই কৃষ্ণের গায়ে হাত বোলাতো। কেমন জানি ঘিনঘিনে লাগতো তার। একবার সাঁইথিয়ার বাজারে নটবর সেজি ভিক্ষে করবার সময় বিশাখা খপ করি তার হাত ধরি বলে, 'তুমি তো সত্যিকারের কেষ্টো ঠাকুর গো। ইদের সুঙ্গি কি মরতি আছো। আমাদের দলে যোগ দেবে চলো।' ব্যাস, ঐ বাজার থেকেই ভোঁকাট্টা কৃষ্ণ। বিশাখা তাকে শেয়ালদহে নে এনে বসিরহাটগামী ট্রেনে চাপালে, কৃষ্ণ বলে ফেলে, 'ও বিশু তুই তো আমারে বাড়ি নে চললি'। বিশু হেসে বলে, 'আমাদের কংসদার কারাগারখানা যে উদিকেই। কিন্তু আমাদের দলের নেয়ম যে যা পার্ট করে তারে সে নামে ডাকতি হয়। আমরা সঙ সাজি তাই আমাদের আসল পরিচয় কাউরে জানানো মানা আছে কংসদার। আমারে তুমি বিশাখা বলেই ডেকো।' ট্রেনের জানলা দে ভরা বর্ষার গাভীন মেঘগুলো চাতকের মতো দেখতি দেখতি কৃষ্ণ বেলিয়াঘাটা, হাড়োয়া, মালতীপুর ইস্টীশানগুলো পার হতি লাগলো। রেল লাইনের দু'ধারে ধু ধু জলকরের টোমঘরের দিকে চে কৃষ্ণ ফস করি বলি ওঠে, 'বিশাখা তোর কংসের কারাগারে ঢোকার আগে এট্টিবার বাড়ি যাব।' আকাশের শ্লেট রঙের মেঘের ফাঁক দে উঁকি মেরে রোদের এক চিলতে হলুদ রংখানা মায়ের পরনের হলুদ রঙের ছাপার শাড়িটাকে বড়ো মনে পড়িয়ে দেয় কৃষ্ণের। বিশাখা বলেছিল, 'তোরে যদি আসতি না দেয় আর তারা?' ভুবনমোহন হাসি দিয়ে বলে কৃষ্ণ, 'পলাবো'।

ঘরে ফেরা কৃষ্ণের মধুর হয়নি। গে শোনে মা ছ'মাস আগে কি এক অজানা জ্বরে মরে গেছে। ঠাকুমা নাতির থেকেও বিপত্নীক ছেলের মধ্যযৌবন থেকি বাকি জেবন কি করি চলবে তার চিন্তায় আকুল। কাল বছর কাটলেই ছাদনাতলায় ছেলেরে পাঠাবে এই তার সিদ্ধান্ত। পরের ভাই-বোন দুটি নিতান্তই বালক, বালিকা। অবোধ। তারা খানিক দূরে দাঁড়িয়ে খালি তাদের দাদাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এবার লুকোচুরি না রীতিমত মাছের ঝোল ভাত খেয়ে, ভাত ঘুম দে বাবাকে প্রণাম করে কৃষ্ণ বিদায় নেয়। ঠাকুমা শুধু বিনবিন করি কেঁদে ছিল প্রণাম নেওয়ার সময়। বলেছিল, 'মাঝে মাঝে আসিস। কবে আছি কবে নেই'।

ইছামতীর ধারে বসি বসি সেসপ কথা বড়ো মনে পড়ে কৃষ্ণর। নদীর পারের তলতলে কাদামাটির ওপর তে' চোখো মাছগুলো মাঝেমাঝেই ভেসি উঠছে। ছোটছোট তেলি কাঁকড়াগুলো গুটিগুটি পায়ে দিকভোলার মতো হেঁটি চলিছে ইদিক-উদিক। এদিকে নাবালের জমিতে বড়ো বড়ো জলঘাসগুলো লকলক করছে। একটা বিষহীন জলঢোরা কাদার উপর দে সরসর করি নেমি জলে চলি গেল। কিছুক্ষণ জলের বুকে সাপ চলার আঁক দেখা যায়। কৃষ্ণেরও ইচ্ছা করে অমনিভাবে ইছামতীর জলে হারিয়ে যেতি। বড়ো জিরাকপুরের সরকারি জমিতে বলতি গেলি স্থায়ী আস্তানা গেঁড়ে নিয়েছে 'কংসের কারাগার'। কত দূরদূর মুলুক থেকি এ দলের কুশিলবেরা যে ইখানে এসে ভীড়েছে তা চমকে দেওয়ার মতো সে সপ কাহিনী। কৃষ্ণের বাড়িই ধরতি গেলি সব থেকি কাছে। প্রায় ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বেস ফেলে, তবু এই পাঁচ বছরে আর মন টানেনি সেখানে যেতি। তবে মেঘের গর্ভ ফেটি হলুদ রঙের কলকে ফুলের মতো আলো আলো রোদটা উঠলেই মার সেই হলুদ রঙের ছাপার শাড়িটার কথা মনি পড়ি যায়। বিশাখা একদিন চুপি চুপি বলেছিল, 'চ কেষ্টাদা তোর বাপের নোতুন বৌটাকে দেখি আসি।' কৃষ্ণ মুচকি হেসে উত্তর করে, 'বৌটাও যদি হলুদ ছাপা শাড়ি পড়ি থাকে। তার চে এই ভালো।' বিশাখা কৃষ্ণের কথার মাথামুন্ডু কিছু বুঝতি না পেরি ভ্যাবলা মেরি তাকায়ে ছিল ড্যাবড্যাব করি। শুধু বিশাখা সখি কেন কংসের কারাগারের কেউই তার রকমসকম বোঝে না। তবে মানুষটা যে খাঁটী ভগবান কৃষ্ণের মতোই নির্ভেজাল তা এদ্দিনে সক্কলে বুঝে গেছে। পারতপক্ষে নেশাভাণ করে না। গ্রামের মেয়ে, বৌউদের পেছনে মশার চাকের মতো পোঁ পোঁ করি বেড়ায় না। নিজের খেয়ালে থাকে। অভিনয়ের সময় ছাড়া রাধুটাকে তো কাছে ঘেঁষতি দেয় না। কংসও তাকে বিশ্বেস করে। গাঁয়ের বৌ-ঝিরা ছেলেপিলের পেট নামলি বা ভয় খেলি কৃষ্ণের কাছে নে আনে। বলে, 'দেও দেখি বাবা মধুসূদন বাছার মাথায় হাত খানা ছুঁইয়ে'। সেই থেকিই বোধহয় কচি বাচ্চার গায়ের গন্ধ তাকে পাগলের মতো টানে। কলাটা, মুলোটা পাঁচ, দশ টাকা আয়ও হয় ভালো। তবে ওসব নে কৃষ্ণের মাথাব্যাথা নেই। সে আছে নিজেই নিজের রসে মজে। আর এখন তো লাট্টু তার দিন রাত গুলিয়ে দিয়েছে।

(৩)

বড়ো জিরাকপুর বিডিও অফিসের পাশে কুমীরের পিঠের মতো এই জায়গাখানা প্রেত্থম থেকি মনে ধরিছিল কংসের। দল নে সে যখন বর্ধমানের তালদি ছেড়ি ইখানে আসে তখন ভরা শীত। বিডিও কর্তার মৌখিক আদেশে আর গাঁয়ের লোকেদের আশকারায় এই কুমীরের পিঠের উপর চরি বসে কংস। খর, বাঁশ, চ্যাঁচারি গাঁয়ের লোকেরাই জুটিয়ে দে ছিল। পলিথিন স্বয়ং বিডিও কর্তা। গড়ে ওঠে কংসের কারাগার। এই জমিটার ঠিক পেছনে একডা বড়ো পুকুর আছে। সিখান থেকেই রাঁধা, হাগা-মোতার জল আনে বিশাখা, ললিতারা। খাবার জল আনে বিডিও অফিসের টেপা কল থেকি। রাঁধু আনে। সত্যভামা সেই সাতসকালে একডা আস্ত খেঁজুরপাতা পুকুরে ফেলি রেখেছিল। বিকালবেলা সেটা হিড়হিড় করি টেনে এনি উঠোনে ফেললি দেখা যায় তাতি ফুল ফোঁটার মত গেঁড়ী-গুগলি জড়িয়ে আছে। তার মানে আজ রাতের মেনু গেঁড়ী-গুগলির ঝাল আর ভাত। গোল হয়ি সপ বসে পাতার গায়ে লেগে থাকা গেঁড়ী-গুগলি গুলো ছাড়াতি। লাট্টু ঘুমাচ্ছে বলে তাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে কৃষ্ণও এসি বসে। বিশাখাই তখন কানেকানে ফিসফিস করি খবরডা দেয়। প্রেত্থমটা শুনি বিশ্বাস করতি পারেনি কৃষ্ণ। বিশাখা বলে, 'তুমি কিস্যু করতি পারবা নাগো ওরগো সুঙ্গি'। কৃষ্ণ জানতি চায়, 'ওরগো মানী?' বিশাখা নিচু গলায় বলে, 'কংসদা আর আয়ান, লাট্টুকে ওরা দত্তক না কি বলে তাই দে টাকা নেবে। তিরিশ হাজার টাকায় রফা হয়েছে। যে লোকটা আর বৌটা নেবে তাদের কুনো বাচ্চা নেই তাই। বারাসাত থাকে। লোকটা নাকি সরকারি চাকরি করে।' কৃষ্ণ তবু জিজ্ঞেস করে, 'তুই কি করি জানলি?' বিশাখা বলে, 'আজ দুপুরি রাঁধু পা টিপতি গেছিল কংসদার কাছে। তখন সোহাগ খেতি খেতি হারামীটা বলি দেছে। আর রাঁধু কেমনি পেট পাতলা জানো তো।'

সেই থেকি লাট্টুরে কোলে নে বসি আছে কৃষ্ণ। না সে কোনো মতেই লাট্টুকে কারো কাছে বেঁচতি দেবে না। রাতে খেতেও আসেনি। স্বয়ং কংস তাকে খেতি ডাকতি আসলে ইছামতীর ভরা কোটালের জলের মতো ফুঁসি ওঠে সে—'লাট্টুরে তোমরা বেঁচবার তাল করছো?' কংস হাসি দে বলে, 'মসকরা করছিস কেন? চ' চ খাবি চ। খাওয়ার পর রেস্যালে বসবো। দোলের দিন শো আছে। এই উঠোনেই মঞ্চ হবানে। আগাম নে নেওয়া হই গ্যাছে।' কৃষ্ণ কংসের কথায় টাল খায় না, বরং আরও শক্ত হই গে বলে, 'লাট্টুকে তুমি বেঁচি দেচ্ছো কংসদা?' কংসও খোলোস ছাড়ে, 'ছেনালগিরি করিস না কৃষ্ণ। লাট্টুর বাপ লাট্টুরে দত্তক দেচ্ছে।' 'তালি তুমি টাকা নেচ্ছো কেনো?' গর্জে ওঠে কৃষ্ণ। ঠিক সে সময় ভুঁইফোড়ের মতো উদয় হয় আয়ান। 'আমরা দু'জনেই লাট্টুর বাপ, তাই টাকা ভাগাভাগি করে নিচ্ছি। তাতি তোর এত চুলকোচ্ছে কেন বাবা ত্রাহি মধুসুদন।' কৃষ্ণ প্রায় কোঁকিয়ে ওঠে বলে, 'আমি লাট্টুর বাপ। ও আমার সুদর্শন। একে একে ভীড় জমিয়েছে রাঁধু, বিশাখা, ললিতারা সক্কলে। রাঁধু বলে, 'এ তোমার ভারি অন্যায়'। দেখা যায় একমাত্র বিশাখা ছাড়া সক্কলেই কংস, আয়ানের পক্ষি।

রাত নিঝুম হলি, আকাশের গায়ে জরির ফুলের মতো তারাগুলো জেগি উঠলি কৃষ্ণ লাট্টুকে নে উঠোনে এসি বসে। আহা কি সোন্দর ঘুমাচ্ছে দেখো। ঠিক যেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। বিশাখা এসি পাশে বসে। পিঠে হাত রাখে কৃষ্ণের। এতক্ষণ বশে থাকা কান্নাটা আগল ছাড়া হয়ে ভুঁইয়ে লুটিয়ে পড়ে। বিশাখা বলে, 'ছেলেমানষি করিস না কেষ্টাদা। যেখানি যাবে সেখানি লাট্টু রাজা হই থাকপে। তুই লাট্টুর মায়া ত্যাগ দে। ওরে ওর নোতুন বাপ, মার হাতে তুলি দে'। লাট্টুর শরীরের গন্ধ প্রাণ ভরে সারারাত ধরি নেয় কৃষ্ণ। বলে, 'বেশ আমি সুদর্শনকে ছেড়ে দেব। তবে এট্টা শর্ত, এই দোলে রাধাকৃষ্ণের লীলা না, হবে কৃষ্ণের যশোদা মায়ের হাতে তুলি দেওয়ার পালা। উই দিনিই লাট্টুরে আমি নিজি হাতে তুলি দেবো ওর নতুন বাপ-মায়ের হাতে'।

(৪)

নিমরাজি হলেও সক্কলে শেষ পর্যন্ত সায় দেছিল, বেশ 'মা যশোদার গৃহে যাত্রা' পালাই হবে। কৃষ্ণ বলে, 'ন্যাকড়ার পুতুল না স্বয়ং লাট্টুরে নে অভিনয় হবে। আর বসুদেবের পার্ট করব আমি'। আয়ানের গা জ্বললেও চুপচাপ মেনি নেয়। কৃষ্ণ উল্লাস করি বলে, 'কংসের কারগার থেকি আজ কৃষ্ণ নয় সুদর্শনের মুক্তি'। ঠিক হয় যারা লাট্টুরে দত্তক নেবে, তারা মঞ্চের বাঁ দিকি দাঁড়ায়ে থাকবে, কৃষ্ণ গে তাগো হাতে লাট্টুরে তুলি দেবে।

কৃষ্ণ আজ বসিরহাট বাজারে গে লাট্টুর জন্যি নতুন জামা, খেলনা কিনি আনিছে। আজ যেন তার আর ফুর্তি ধরে না। সারাদিন রঙের হুল্লোর করি গাঁয়ের লোকেরা রাধা-কৃষ্ণের লীলার বদলে 'মা যশোদার গৃহে যাত্রা' দেখতি গে খেপেই উঠেছিল। কৃষ্ণই তাদের শান্ত করে। বসুদেবের চরিত্রে কৃষ্ণের প্রাণ কাড়া হাহাকার করা অভিনয় সক্কলের মন কেড়ি নেয়। স্টেজির উপর টাকার বৃষ্টি পড়ে। রাংতার মুকুটে লাট্টুকে সাতরাজার ধন এক মানিক লাগে। কৃষ্ণের অভিনয় দেখি লাট্টুরে দত্তক নীতি আসা বাপ-মাও চোখের জল মোছে। কথামতো কৃষ্ণ ওদের হাতে তুলি দেয় তার সুদর্শনরে। কৃষ্ণ দেখে বৌটা বুকে চেপি দু'হাত জড়ো করি নমো জানায় কৃষ্ণকে। আহা বৌটার কোলে কি সুন্দর লাগছে বাছাকে। ঠিক যেন মা যশোদার কোলে 'বাল গোপাল'। বোকার মতো কৃষ্ণও হাত জোড় করে। একসময় ভুস করি একডা চার চাকার আওয়াজ হলি পরে, বিশাখা এসি বলে, 'ঘরে চ' কেষ্টাদা। লাট্টুরে ওরা নে গেছে।'

লাট্টুর জন্মের পর এই প্রেথম মদ খেল কৃষ্ণ। লাট্টুর গায়ের দুধ-দুধ গন্ধটা ভুলতে। কড়কড়ে তিরিশ হাজার টাকা আর সাত জায়গায় পালার আমন্ত্রণে 'কংসের কারাগারে' আজ আমোদের বান ডেকেছে। নেশা করি এ ওর গায়ে লুটিয়ে আছে। অতগুলো মদ্দালোকের নাকডাকার শব্দে মনে হচ্ছে পৃথিবীখানাই বুঝি কেঁপি উঠবে। শুধু ঘুম নেই কৃষ্ণের দু'চোখে। সে লাট্টুর ছোটো ছোটো জামা, কাঁথাগুলো বুকির মধ্যি চেপি টলতি, টলতি 'কংসের কারাগার' থেকি বেড়িয়ে আসে। চাঁদটা আকাশে রুপোর থাল হয়ি ঝুলি আছে। কুমীরের পিঠের মতো জমিটা থেকি হামাগুড়ি দে পুকুরির দিকে নামতি থাকে। কি আশ্চর্যি! জলের মধ্যিও অবিকল আর এট্টা চাঁদ। খিলখিল করি নিজির মনি হাসে কৃষ্ণ, 'দুটো চাঁদ'। আচ্ছা চাঁদ যদি দুটো হয় লাট্টু তালি দুটো হতি পারে না কেন? আলবাৎ হবে। তাছাড়া কে কবে দেখেছে যে কৃষ্ণের হাতে সুদর্শন নেই। ঐ তো সুদর্শন। পুকুরের জলের মধ্যি চাঁদটার তলে। 'আসতিছি মানিক। বাপ আমার। এখনই আসতিছি। এট্টুস সবুর কর'। সরসর করি জলের মধ্যি নেমি যায় কৃষ্ণ। যত নামে তত সে লাট্টুরে দেখতি পায়। পা জল, কোমর জল, গলা জল, ডুব জল'।

আর দশটা সকালের মতোই সকাল হয়েছিল বড়ো জিরাকপুর গ্রামটায়। 'কংসের কারাগারের'ও এক এক করি ঘুম ভাঙছিল সকলের। দাঁত মেজি কুল্লুকুচি করি সত্যভামা, লতিতা পুকুর থেকি চলিও আসে। কিন্তু চোখ আটকে যায় বিশাখার। পুকুরের ওপার ঘেঁষি কি ভাসতেছে ওডা! মানুষপানা লাগতেছে না? গো গো করি ওঠে বিশাখা। আউ আউ করি ফিরি এসি 'কেষ্টাদা' বলি চিক্কুর মারে। না কৃষ্ণ কোথাও নেই। কেন থাকবে। এই ত্রিসংসারি কোথাও কি কংস এমন কারাগার বানাতি পেরিছে যেখানি কৃষ্ণরে ধরি রাখা যায়। গাঁয়ের লোক আজ এখানে ভেঙি পড়িছে। সক্কলের চোখে জল। কংস শুধু আয়ানরে পরামর্শ দেয়, 'মওকা বুঝি কেটি পর'। এট্টুস পর পুলিশ আসবানে। ভগবানের লাশ নে যাওয়া হবে কাটা ছেঁড়ার জন্যি'। তবে সকালবেলায় এই ধরাধামের কোথাও কি হরিতলায় জল দিতি গে কেউ সুর করি গাইছে না! ....

'শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল
ব্রজ বালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল
....।'

ডাস্টবিনের জন্য

তৃপ্তি সাস্ত্রা

আমাদের ছিল লেবুতলা, ছাইয়ের গাদা, কলেজ পুকুর, টমপ্যারী টাওয়ার, কবুতর শালিখ মেনী হুলো চড়াই কাক এমন কী চিল শকুন। কিন্তু ডাস্টবিন ছিল না।

প্রথম ডাস্টবিন অফিসে দেখেছি যেন। রাজমহল রোডের ওপর ব্রিটিশ ছাদের একতলা ভূমি সংস্কার অফিস। বড়দার অফিস। সেখানে কাগজ ফেলার বাস্কেট দেখেছি।

বাড়িতে ডাস্টবিন ছিল না কারণ কোনও কিছুই বাড়তি নয়—সবটাই কিছু না কিছু কাজে লেগে যায়। তরকারির খোসা গরুছাগল খায় নয় মাটিতে মিশে উর্বরতা বাড়ায়। মাছ মাংসর টুকরোর জন্য তো বিরাট পার্টি লাইনে আছে। বিড়াল কুকুর চিল এমন কী লেবু গাছও পর্যন্ত। ঝেঁপে ফল আসার জন্য গাছের গোড়ায় গোল করে খাড়ি কেটে কুঁচো মাছের পথ্যি দিতে হয়। সবুজ ঘোমটার ফাঁক দিয়ে গাছ চেয়ে থাকে কুঁচো মাছের দিকে। খাবার পচা বা নষ্ট হবার কোনও চান্স নেই। মা ষষ্ঠীর কৃপায় সব বাড়িই জমজমাট। বরং সবার পাতে খাবার দেবার জন্য গিন্নিদের নানারকম ম্যানেজমেন্ট পলিসি থাকে। এমবিএ পাশ না করেও তারা নিখুঁত পরিচালনা পারে। একটু নমুনা দিই কবিতায়—

'চারটি ডিম ষোলোজন খাবে
সুতো দিয়ে নিপুণভাবে কীভাবে ভাগ ভাবো।
এক সকালে কলাই থোড় মোচা
নটে শাক—উনুন একটাই।
ঘুঁটে খটখটে হলেও গুল কাঁচা।
আঠারো জনকে খাইয়ে চারজন
হেঁসেল যখন খাব খাব ভাবছে
ঠিক তখনই আবার সাড়ে পাঁচজন
অতিথি নারায়ণ—এখন?
দীপুর বই তাপু পড়েছে তাপুর বই
বুড়ো, বুড়োর বই লতু
কাঁথাও আলাদা লাগেনি ওদের—মাস্টার প্ল্যানিং?
দু দুটো আইবুড়ো ননদ ডিঙিয়ে কত সাবধানে
তাদের দাদার পাশে শোওয়া
টিন ছাদ। জবজবে ঘাম।
ঘামকে নদী বানানোর জন্য কোন রূপটান—ভাবো।'

এ হেন যাপনে কোনও গোদরেজ বা স্টিল আলমারি নেই। কাঁচ দেওয়া কাঠের আলমারি, সিন্দাবাদের সিন্দুকের মতো কাঠের বাক্স আর মায়ের একটা ঢাউস ট্রাঙ্ক—এই তো বিষয় আশয়। বইপত্র? ওই যেমন কবিতায় দীপুর বই তাপু পড়ছে, তাপুর বই বুড়ো ....। আমি আর ছোড়দি প্রায় বছর সাতেকের ছোটো বড়—তাই আমি বরাবর নতুন বই। চার দিস্তা কাগজ দিয়ে বাঁধানো, ছাপা নীল কাগজের মলাট দেওয়া খাতা আর বড়দা, মেজদার শেষ হয়ে যাওয়া বাতিল শর্টহ্যান্ড খাতায় অঙ্ক প্র্যাকটিস। জমানো প্যাকেট প্লাস্টিক মোড়ক এসব কোথাও কিছু নেই। ছোড়দা শৌখিন। বইয়ের শখ। সেই ছয়ের দশকেই দেশ নেয়। খুব যত্ন করে বই পত্র রাখে। প্যাকেট কোথায়? থলে করে বাজার আসে। চটের থলে আর শক্ত চাদর, প্যান্ট কেটে কাপড়ের ব্যাগ। ভূষণদার মুদিখানার দোকান আর শান্তি বেকারীর মালপত্র কাগজের ঠোঙাতেই আসে। কাগজের ঠোঙা আবর্জনা নয়, উনুন ধরানোর কাজে দিব্যি লাগে। পেয়ারা, নিম ডাল, মাঙ্কি ব্যান্ডের দাঁতের মাজনের পাশাপাশি, ছাই দিয়ে বাসন মাজা। দাঁত মাজা। ছাইয়ের গাদায় নেড়িরা থাকলেও, আমাদের পোষ্য প্যারী টাওয়ার কেউই ছাইয়ের গাদায় যেত না। তারা বড় বাবু।

পাকা বাড়ির বারান্দার সিলিং-এ চাটাই দিয়ে পায়রা ঘর। খুবই নোংরা করত বারান্দা। তো তাদের বাহ্যও অমূল্য। ফেলা যাবে না। গাছের সার হবে। শুধু আমাদের বাড়ির জোগান দিয়েই তার প্রয়োজন মিটবে তা নয়, পাশের দত্ত বাড়ির সোনাদা (অনিক দত্ত—প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী)-ও নিয়ে যাবেন সে বর্জ্য—খুব ভালো গোলাপের সার।

আটের দশকে নতুন সংসারে যে যে বাড়িতে থাকলাম—প্রথমে ভাড়া বাড়ি, পরে নিজের বাড়ি—দুই বাড়ির পাশেই বড় পুকুর, ফাঁকা মাঠ, গর্ত, খানাখন্দ। ঘরে প্লাস্টিকের ছোট পাত্র, বিন বা ডাস্টবিন ঢোকেনি। কিন্তু অন্যরকম বর্জ্যর একটা বাতিল পর্ব তো শুরু হয়েছে। সাতের দশকে যখন আমাদের কৈশোর বেলা থেকে যৌবনের উত্তরণ পর্ব, অদৃশ্য ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছি অনেক হাবিজাবি মথিলিখিত সুসমাচার। নাটক, আবৃত্তি, ছোটো পত্রিকা—এসব নিয়ে অন্য এক জগৎ।

টিউশ্যানি করি, সেলফ্ হেলপের ট্রেনিং-এ টাইপ শিখি, লেখা পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে বার্লোর প্রাইমারিতে চাকরিও পেয়ে গেলাম। আরো পড়বো। নিজের পায়ে দাঁড়াবো। বি.এ পাশ করেই বিয়ের পিঁড়িতে বসার বস্তাপচা সিলেবাস ফেলে দিয়েছি ডাস্টবিনে। অনার্সে, আমাদের ব্যাচে আমি একা মেয়ে—বাকী চারজন ছেলে। মেয়েদের শুধু মেয়ে বন্ধু এই ধারণাটাই পাল্টে যাচ্ছে। বাড়িতে সবার ছোটো হবার দরুণ বাবা, দাদাদের বন্ধুদের প্রচুর আস্কারা পাই। নাটকের লোকজন আর সাহিত্য পত্রিকা—এসব নিয়ে চেনা জানা পরিসর নেহাৎ ছোটো ছিল না। পুব বাংলা থেকে আসা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার আমরা। চাকুরীজীবী। কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও কালী শিব সবাই আছেন কিন্তু খুব কঠিন নিয়ম কানুন নেই। সববারেই আমিষ। তাবিজ, জ্যোতিষের কোনও এনট্রান্স নেই। বাড়িতে ব্রত পুজো পাঠের দৈনন্দিকতা। কিন্তু সাতের দশকের সাম্যবাদী ভাবনা চিন্তার স্রোতে সে সব আমার মাথা থেকে উবে গেল।

টুকটাক লিখছি। সিনেমা-নাটক ভালোবাসি কিন্তু ভালো নাটক, সিনেমা মফঃস্বল শহরে সব সময় মেলে না। বইয়ের ডানায় ভর করে ওড়া যায় ভালো, বইটাকেই আঁকড়ে ধরি। যা পাই তাই পড়ে ফেলার একটা ঝোঁক ছিল। আর পড়তে পড়তেই ফেলে দিতে শিখি। মাথার ভেতর একটা ভাঁড়ার আর একটা বীন। হাল্কা মুচমুচে স্ন্যাক্স ভালোই লাগে, কিন্তু বেশি দিন নয়। বাস্তবের রগরগে ঘটনার ছয়লাপ পড়তে পড়তে মনে হয় এর চেয়ে ইতিহাস পাঠই ভালো। অমল, অপুর পাশাপাশি কঙ্কাবতী টানে। ইভান ইলিচ আর লাঞ্ছিত নিপীড়িত বুড়োকে ভালো লেগে যায় খুব। মেঘনাদ টানে এমনকী দুর্যোধনও।

সাতের দশক মুক্তির দশক। জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহতদের মুক্তি হবে—সাম্যবাদের পথেই হবে—এই সব স্বপ্ন মোহ আকাশে বাতাসে। বিপ্লব এসে গেছে। শুধু নকশাল বাড়ি নয়—গোপীবল্লভপুর মেদিনীপুর থেকে সারা দেশ জুড়ে। বিপ্লব এসেছে কী করে বোঝা যায়? অনীক চট্টোপাধ্যায়রা বোঝায়—

'—সবখানেই বিপ্লব হবার সময় হয়েছে, কী করে বুঝব অনীকদা? এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—ভাত রান্নার সময় কি আর সব চাল আলাদা আলাদা করে টিপে দেখতে হয়? একটা চাল টিপে দেখলেই বোঝা যায় হাঁড়ির ভাত হয়েছে কিনা।

এই আলোচনায় অনীকদা ভাত রাঁধতে জানে দেখে জবার আনন্দ হয়। যদিও একটা মানুষকে টিপে হাজার মানুষের নাড়ি বোঝার ব্যাপারটা জবা ঠিক বোঝেনি।' (চিরকুট, পৃ. ২৮)

তবু সাতের দশক মুক্তির দশক হবে এই স্বপ্ন। নকশাল বাড়ি আন্দোলনে পাড়ার দুজন শহীদ হলেন। বহরমপুর জেলে ১৯৭১-এর ২৪ ফেব্রুয়ারিতে নৃপেন হালদার (বাবলু) পরে বন্দুক ছিনতাই করতে গিয়ে নকশাল নেতা সুদীপ্ত মৈত্র, বিচ্ছুদা। মৃত বলে ঘোষিত হয়েও ফিরে এসেছে পিন্টু (মৃদুল সরকার)। বহরমপুর জেলে পুলিশী অত্যাচারে ধুঁকছে। পলিটেকনিক ডিপ্লোমা অর্দ্ধেক করে জেলে গিয়েছিল, সেটা কমপ্লিট করতে সে মরীয়া। 'রাজনীতি করব না' মুচলেকা দিতে হয়েছে, তার বিবেক দংশন। কিম্ভূত কিমাকার প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা। 'ডাউন টু আর্থ' হতে গিয়ে তেঁতুলতলার নেশার ঠেক। প্রেমে পড়েছি তার। পঠন পাঠন পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্বে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছি। প্রেমের হড়কা বান। সবার বারন বাঁধা উপেক্ষা করে এক সাথে চলার জেদ। নকশাল করা ছেলে একরকম ক্রিমিনাল। সমাজ পরিবারের চূড়ান্ত আপত্তি সেই পথ চলায়। ফেলে দে। ফেলে দে। হাতের লেখা ভালো বলে পোস্টার লিখেছিলি যেমন। পাড়া ভর্তি পুলিশের চর। বলেছিলাম, ফেলে দে ফেলে দে। হয় দুমড়ে মুচড়ে নয় পুড়িয়ে। তেমন ভাবে ফেলে দে নকশাল প্রেমিককে। ভাইকে। দাদাকে। সাতের দশক মুক্তির দশক। বিক্ষোভ। বিদ্রোহ। উত্তাল। ছিন্ন পলাশের মতো লাশ। সারা দেশটা যেন ভাগাড়। ডাস্টবিন। এ মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না।

এইভাবে কখন বাবু কলোনির বুকেও ধাক্কা দিচ্ছে অন্য স্রোত। অসম্ভব একটা বিরুদ্ধ মত তৈরি হচ্ছে। যে সিনেমা সাহিত্য সবার ভালো লাগত, ভালো লাগছে না। সে উপন্যাস, গল্পকে সবাই ছিঃ ছিঃ করছে—তত খারাপ লাগছে না।

হাতে এসেছে 'বেলা অবেলা কালবেলা', আশিসদা শোনাচ্ছেন 'জনান্তিকে'—আবৃত্তির হাততালি কবিতা, রাগী কবিতা, আবেগের থরো থরো কবিতার চেয়ে কত দূরের এক অন্য ভুবন।

নেহাৎ চাঁদ ফুলপাখি শুভদৃষ্টি ফুলশয্যা হয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ নয় আর পৃথিবী—সাহিত্য সিনেমায় খুঁজছি বহুমাত্রিক শেড। সম্মানিত, পুরস্কৃত, প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সাহিত্যিক নিয়ে বিষম গোল বেঁধেছে মনে। প্রকৃত শিল্পী কী প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ে যাবেন না কী দাঁড়াবেন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে?

খ্যাতি রসে জরো জরো এলিট কবি লেখকরা প্রতিষ্ঠা আর প্রতিষ্ঠানের বোতলে আটকে, বোতলকেই বিশ্ব ভাবতে পারেন। সময় বড় নিষ্ঠুর। বাতিল বোতলকে ডাস্টবিনে ফেলতে দ্বিধা করবে না। ধেয়ে বিশ্বায়ন এলো। মুক্ত বাজার। অবাধ শিক্ষা। অবাধ বাণিজ্য। অবাধ লেখনী। তাদেরকে পরিবেশনের জন্য ক্যাটারার। ক্যাটারারদের টেন্ডারের জন্য সিন্ডিকেট রাজ। তাদের পেছনে ছুটতে গিয়ে লেখা হারায় ধাপার মাঠে। কী

একটা সুর বিন বিন করে মাথায় অর্থ নয় কীর্তি নয় স্বচ্ছলতা নয়। কী এক বিপন্ন বিস্ময় ... সঠিক ও যথার্থ শিল্প নির্মাণের জন্য শিল্পী সর্বদাই নিজেকে ভাঙবেন এবং এভাবেই তিনি সর্বদাই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। এই বিপন্নতা। এই বিস্ময় ....

এবং এই পাল্টে যাওয়া। প্রতিটি দিন বাজারের। প্রতিটি দিন সেলিব্রেশন। প্রতিটি দিন উপহারের মোড়ক খোলার DAY। মোড়কে মোড়কে মাটি আকাশ ঢেকে যায়। ছোটোবেলায় যে ডাস্টবিন খুঁজে পাইনি—গুঁড়ি মেরে সে কখন ঢেকে ফেলে পরিবেশ পরিচিতি।

মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে। মুখ ঢেকে যায় প্রসাধনে। খুব ছোটোবেলায় স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মী দুই বোন শহরে বিখ্যাত ছিল 'পেইন্টিং বক্স' নামে—খুব চড়া মেক-আপে অফিসে আসতেন তারা। এখন যে পাড়ায় থাকি কুড়ি বছর আগে সে তল্লাটে একমাত্র সুবলদার বউ 'লিপস্টিক বউদি' বলে পরিচিত ছিলেন—ভোর পাঁচটার মর্নিং ওয়াকেও কোনও সময় রঙ ছাড়া ঠোঁটে দেখা যায়নি তাকে। ঘন রঙ মাখা ঠোঁটে বৌদির সরল স্বীকারোক্তি—'এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, ভালো লাগে না গো'। আর এখন বরিন্দর গলগলে রোদে গলে পড়ছে আপামর সুন্দরীদের ঠোঁট চোখমুখ। রাঙামাটির পথের অজস্র শিমুল পলাশও যেন কনফিডেন্ট নয় নিজের পাপড়ি আর রঙ নিয়ে। ফেলে দেওয়া পাউচের স্তূপ থেকে খুঁজে নিচ্ছে বাতিল রঙের টিউব।

সেই যে ডাস্টবিন নেই কড়ি পাড়ার গল্প দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম, কালক্রমে সে হয়েছিল সাজানো গোছানো এলিট পাড়া। সেই পাড়া ছেড়ে রেল লাইনের ওপারে খুব সস্তার জমি, কিনলাম। পুকুর-কাশফুল-ইটভাটা—শ্যাওড়া খেঁজুর গাছ—সে তেপান্তর দেখে উদ্বাস্তু কলোনি থেকে এলিট হয়ে যাওয়া পাড়া হায় হায় করে উঠেছিল। পাঁচ-ছ কাঠা জমি নিয়ে এক একটা বাড়ি কলোনির তখনও বোঝেনি আত্ম প্রতিষ্ঠায় মুছে যাবে আত্মপরিচয়। ভিটে বেচেই টিকে থাকতে হবে ৬০০-৭০০ স্কোয়ারফিটের কংক্রীটের বস্তিতে। আমাদের নতুন ফাঁকা পাড়াতেও তাই। প্রথমে বেঁধে বেঁধে থাকার প্রয়াস। দ্রুত পুকুর টুকুর বুজিয়ে একতলা বাসগৃহের দোতলা তিনতলা হয়ে যাওয়া। বাড়ির মালিক থেকে ক্রমে ভাড়া বাড়ির মালিক হওয়ার আত্মতৃপ্তি। মুখোমুখি দেখা হলে, কথা বলার সময় না থাকলেও, দুর্গাপুজো, কালীপুজো থেকে ক্রমে ক্রমে শনি গণেশ লোকনাথ পুজো ঘিরে কৌম হওয়ার উদ্‌যাপন আছে। সংস্কৃতিতো কোনও ভুস্ করে ভেসে ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার নয়, সামাজিক ব্যাপার।

পুরনো পৃথিবীর পাঠক্রমে, যা যা রুচিহীন জেনেছি—লোক দেখানো আচরণ, বড়লোকি দেখানো মনোভাব, দীনদরিদ্রকে বৈভব দেখানোর কালচার—এইসব কিছুই সামাজিক ভাবে স্বীকৃতি পেয়ে যত্রতত্র যা খুশি করার ছাড়পত্র পেয়ে গেল। নিজস্ব রুচির মান দিয়ে বাঁধা সংস্কৃতি রইল না। বিড়ালের বিয়ে দিয়ে বৈভব প্রকাশের ফর্ম পাল্টে এলো Day Celebration-এর নানা ফর্ম। এইসব হ্যা হ্যা উন্মাদনার একমাত্র লক্ষ্য দগদগে বৈভব প্রদর্শনে ঈর্ষা কাতর প্রতিবেশীর বুকে ঈর্ষার সবুজ দৈত্যকে চড়িয়ে দেওয়া। বাজারের গ্রুমিং মতো ভালো বউ, ভালো বাবা, ভালো মা হওয়ার যে প্যাকেজিং; জীবনের ওঠাপড়া গায়ে না লাগার যে বুদ্বুদ সুরক্ষা—তা এমনই স্বর্গীয় মোহময় যে এর বাইরের পৃথিবীকে কেমন ডাস্টবিন মনে হয়। অভাব দৈন্য অনাহার উচ্ছেদ জলজমি কারখানা শোষন বঞ্চনা নিয়ে কারা এরা ভাতরুটির জন্য চ্যাঁচায়—! এত নোংরা আবর্জনার মতো মানুষ, এইজন্যই না শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পার্কের মতো পৃথিবী চাই। আমরা কিছু দেখব না কিন্তু আমাদের মিনিটস্ ডিটেলস্ দেখো তোমরা। দেখ আমার ড্রেস মেটেরিয়াল ঘর বাড়ি আসবাব গয়নাগাটি বেডরুম টয়লেট। আমার প্রেম দেখো। হানিমুন দেখো। দেখাবার মতো হলে প্রাইভেট কিছু নেই সব পাবলিক। আমাদের যাপন 'দ্য গ্রেটেস্ট শো' অন দ্য আর্থ। এই শো-বিজনেসে পৃথিবী আই মিন্ ওয়ার্ল্ড ডার্টি ডাস্টবিন হলে, স্যরি ওল্ড হ্যাগ, উই হ্যাভ টু লীভ্, অন্য গ্রহের ভালো অফার আছে ....।

ডাস্টবিন

রাহুল দাশগুপ্ত

একটা সময় গোটা দুনিয়ায় এই শহরটার খুব নামডাক ছিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিজের স্ত্রীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন।

বৃদ্ধের বয়স গত মাসে সত্তর ছুঁয়েছে। স্ত্রী সবে বাহান্ন। দেখে আরও কম বয়স মনে হয়। দুনিয়াটা তাঁর চোখে এখনও রঙিন। এয়ারপোর্টে দু-ঘন্টা সময় ফালতু না কাটিয়ে শহরটা ঘুরে দেখার বায়নাটা তারই।

বৃদ্ধ ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। এই শহরের নাড়িনক্ষত্র তিনি জানেন। শহরটা এক সময় উপনিবেশের কেন্দ্র ছিল। এখন এটাকে একটা 'মৃত শহর' বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

স্ত্রী বলেছিলেন, আমি কোনওদিন মৃত শহর দেখিনি। চলো না, সময় তো আছে। একটু ঘুরে দেখি।

স্ত্রীর কথায় বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেছিলেন। এটাই তাঁর স্বভাব।

স্ত্রী জানতে চেয়েছিলেন, এই দুনিয়ায় মৃত শহর কী অনেক?

অনেক। বৃদ্ধ মৃদু হেসে বলেছিলেন।

তাঁদের গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছিল একটা ফুলের বাগানের সামনে। বৃদ্ধ বলছিলেন, এই বাগানের একটা ইতিহাস আছে।

বৃদ্ধ বাগানটির ইতিহাস বলছিলেন। স্ত্রী তাকিয়ে ছিলেন সামনের সরোবরের দিকে। স্বচ্ছ জল তার। সেই জলে ফুটে আছে নানা রঙের পদ্ম। দূরে, সরোবরের ধারে, পরপর অনেকগুলো লরি দাঁড়িয়ে। সেগুলোর গায়ে অসম্ভব নোংরা।

স্ত্রী জানতে চাইলেন, ওই নোংরা লরিগুলো এখানে কেন?

এই সরোবরটা বুজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গোটা বাগানটাই ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। বৃদ্ধ বলে উঠলেন।

কেন? স্ত্রী চমকে উঠলেন। তারপর বললেন, তুমি যে বলেছিলে, এই বাগানটাই গোটা শহরের ফুসফুস?

বৃদ্ধ মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, মৃতের আবার ফুসফুসের প্রয়োজন কী? সে কী শ্বাস-প্রশ্বাস নেবে?

স্ত্রী সামনের একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলেন। তাঁর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। জানতে চাইলেন, কেন? কেন ধ্বংস করে দেওয়া হবে প্রকৃতির এই অপরূপ সৃষ্টিকে?

কারণ, বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বললেন, এখানে একটা শপিং মল হবে। জীবন্ত, সতেজ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বদলে মৃত, শৌখিন পণ্যদ্রব্যে ভরে দেওয়া হবে জায়গাটা ...

এরা কী গোটা শহরটাকেই বাজার করে ছাড়বে?

ছাড়বে নয়, ছেড়েছে। বৃদ্ধ হাসলেন। আর তুমি তো জানোই, বাজারের ধর্ম বলো, নীতি বলো, সত্য বলো, দর্শন বলো, সবই এক। আর তা হলো, কেনাবেচা। বাজার সবসময়ই কেনাবেচায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। এর বাইরে ভাবতেই পারে না। বাজারের মন নেই, হৃদয় নেই, রুচি নেই, আত্মা নেই, সংস্কৃতি নেই, বিবেক নেই, মস্তিষ্ক নেই। বাজার শুধু বোঝে, মুনাফা। লাভ। বাজারের শুধু একটাই স্বভাব, একটাই প্রবৃত্তি, আর তা হলো, লোভ। সীমাহীন লোভ। বস্তুর প্রতি লোভ, অর্থের প্রতি লোভ, সুবিধার প্রতি লোভ, শরীরের প্রতি লোভ। সম্পর্কের মধ্যেও এরা শুধু মুনাফা খোঁজে, লাভ-লোকসান খোঁজে, উষ্ণতা খোঁজে না। মানুষকে এরা বিচার করে তার চেয়ার দিয়ে, তার মেধা বা যোগ্যতা দিয়ে নয়। সেখানেও শুধু স্বার্থ আর লাভ-লোকসান নিয়েই ভাবে। মুনাফার প্রতি, ছোটো ছোটো স্বার্থের প্রতি, লাভের প্রতি সীমাহীন লোভই এদের বিকৃত করেছে। পচে, গলে গেছে গোটা শহরটা। সেই পচা, গলা, মৃত শহরটাকেই এখন তুমি দেখছো ...

কিন্তু মৃত্যু একটা শহরকে কী দিতে পারে?

বৃদ্ধ এবার হো হো করে হেসে ওঠেন। তারপর বলেন, অন্ধতা।

স্ত্রী শিউরে ওঠেন। জানতে চান, অন্ধতা?

ঠিক তাই। অন্ধতা। মৃত্যু মানে অন্ধকার। আলো সেখানে থাকতে পারে না! একটা মৃত শহর স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্ধতাকে অভ্যর্থনা জানায়। ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখলে ....

কিন্তু এই মৃত্যু তো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। এ তো হত্যা ...

তুমি বলছো, খুন? সে তো প্রতারকরা বলে। তাদের ভাষায়, ওরা বাইরে থেকে এসে আমাদের খুন করে গেছে। না, না। আমার তো মনে হয়, আত্মহত্যা। আমি বলব, তোমরা খুন হতে দিলে কেন? তোমরা ঘুমিয়ে ছিলে? তোমরা ওদের অভ্যর্থনা করোনি? ওদের খাতির-যত্ন করোনি? ওদের ফিসফিসানি শুনে একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরোনি? একে অপরের শরীরে চাবুকের দাগ বসিয়ে দাওনি? তোমরা সংখ্যায় ছিলে অগণিত। ওরা ক'জন ছিল? তোমরা চাওনি, কেউ এসে তোমাদের হত্যা করে যাক? মৃত্যুর বীজ তোমরা নিজেরা বহন করোনি? তাহলে এটা কী আত্মহত্যা নয়? তোমরা যা চেয়েছিলে, তোমাদের সম্মতি নিয়ে, ওরা সেটাই করেছে। তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করেছো। হত্যা করে চলেছো। আর হত্যাকারীর নাম জানতে চাইলে, ওদের হাত খুঁজছো আর লুকিয়ে ফেলছো নিজেদের হাত। যতদিন এই আত্ম-প্রবঞ্চনা থাকবে, ততোদিন এই আত্মহত্যা চলতেই থাকবে ...

তুমি কী বলতে চাও?

একটা মৃত শহরকে কীভাবে চেনা যায়, জানো? বৃদ্ধ বললেন, তার চোখ দিয়ে। একটা মৃত শহরের কোনও চোখ থাকে না। চোখের বদলে শুধু থাকে দু'টো বড়ো বড়ো অন্ধকার গর্ত।

কেন?

কারণ, একমাত্র চোখই পারে আলোকে অভ্যর্থনা জানাতে। আর আলোই তো পারে রুচি, মেধা, বিবেক, বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে। একটা জীবিত শহর অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায়। ছোটো ছোটো স্বার্থের জন্য ভবিষ্যতের মঙ্গলকে বিসর্জন দেয় না। আর এই মঙ্গলকে দেখতে পায় বলেই তারা মানুষের জন্য, দেশের জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য ভাবে, কিছু করার চেষ্টা করে, নিজেদের শুভবোধকে জিইয়ে রাখে, নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখে। কিন্তু মৃত শহরের তো চোখ নেই! শুধু অন্ধকার গর্ত আছে। সেই গর্তের অন্ধকারে আছে স্বার্থ, হীনতা, লোভ, নীচতা, কুরুচি, বিকৃতি, সংকীর্ণতা, হিংসা, ঈর্ষা, দলাদলি। এখানে সবাই সবাইকে ঠকাচ্ছে। সবাই সবাইকে প্রতারিত করছে। সবাই সবাইকে টপকে উপরে উঠতে চাইছে। সবাই সবাইকে দুমড়ে-মুচড়ে-থেঁতলে দিয়ে নিজে এগিয়ে যেতে চাইছে। সবাই সবার অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। সবাই সবার বেঁচে থাকাকে সঙ্কুচিত করে দিতে চাইছে। ছোটো ছোটো লাভ, ছোটো ছোটো মুনাফা, ছোটো ছোটো সুখ, ছোটো ছোটো জয়, ছোটো ছোটো প্রতিহিংসা, ছোটো ছোটো প্রচার, ছোটো ছোটো ক্ষমতা, ছোটো ছোটো আরাম, বড়ো করে কিছু ভাবতেই পারে না এরা, দূরের কিছু দেখতেই পারে না। সংকীর্ণ জায়গায় নিজেদের সঙ্গে নিজেরা চালাকি করে জীবনটাকে এরা কদর্য করে তুলেছে। গোটা শহরে ছড়িয়ে রেখেছে রক্ত, থুতু আর শ্লেষ্মার দাগ। বাতাসটাকে এরা ঘোলাটে করে দিয়েছে আর দুর্গন্ধে ভরিয়ে তুলেছে। কিন্তু এইসব করে শেষপর্যন্ত কোথায় পৌঁছবে এরা?

একটা মৃত শহরে শ্মশান ছাড়া কোথাও পৌঁছানো যায় না ...

সময় হয়ে গেছিল। ওরা এয়ারপোর্টে ফিরে এলেন। ঠিক ঢোকার মুখেই, বিরাট একটা ছবি। পরপর পাশাপাশি পাঁচটি মুখ।

বৃদ্ধ বললেন, এরা কারা জানো?

কারা? স্ত্রী জানতে চাইলেন।

এই পাঁচজনে মিলে এই শহরটাকে কিনে নিয়েছেন। এরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত ধনী, পুঁজিপতি, শিল্পপতি।

কীসের ব্যবসা এদের?

বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে এসো। প্রথমজন পণ্যদ্রব্য নিয়ে, দ্বিতীয়জন রাজনীতি নিয়ে, তৃতীয়জন ধর্ম নিয়ে, চতুর্থজন শিক্ষা নিয়ে এবং পঞ্চমজন স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসা করেন।

এরাও কী চান না, শহরটা আবার বেঁচে উঠুক?

পাগল হয়েছো! বৃদ্ধ হো হো করে হেসে উঠলেন আবার। তারপর বললেন, জীবিত শহরে ব্যবসা জমে না কী?

চক্ষুহীন, অজ্ঞান, অন্ধকার, মৃত শহরেই তো ওসব ...

আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেছিল বিমানটি। বৃদ্ধ জানতে চাইলেন, শহরটাকে এখনও দেখতে পাচ্ছো?

শহর কোথায়? স্ত্রী ঝটকা দিলেন, ওখানে তো একটা ডাস্টবিন ...

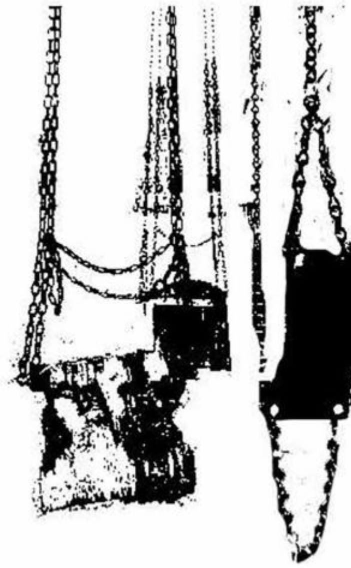

দোলনা

সত্যপ্রিয় ঘোষ

ফাঁকা জায়গাটাকে পার্ক বানিয়ে ফেলতে হল। পাড়া-বেপাড়ার অবাধ্য ছেলেগুলোর খেলা বন্ধ করতে এটাই প্রকৃষ্ট পন্থা। নতুবা বাড়ির বাইরের দেয়ালের স্নো-সেম রঙে বলের ছোপ পড়ে, দুমদাম শব্দ, শার্সি ভাঙে, ঘরের মধ্যেই বল এসে যায়। এর হেস্তনেস্ত করতে মিউনিসিপ্যালিটির স্যাংশন আনতে প্রচুর তেল, গণদরখাস্ত। সিমেন্টের বেঞ্চি বসে গেল চারটে, লোহার শিকল লাগানো পাশাপাশি দুই দোলনা। দিনের বেলা শুধু দোলনার হকযুক্ত ছেলেমেয়ে দোল খাবে, রাতের প্রচ্ছায়া-উপচ্ছায়ায় ওদের মা-দিদারাও একটু। গাছ লাগাতে হল প্রচুর, সেগুলোতে ইটের ঘের। মানে যত পারো ভরাট করো, উড়নদাসেরা খেলতে না পারে। যেখানে ওরা বল সেন্টার করে বা উইকেট পোঁতে সেখানে গোল ক'রে বেদি, তারপর কৃষ্ণচূড়া, দেখতে দেখতে বেড়ে যাবে, ছাতা মেলবে। তবে এ-সব করা গেল মাত্র তিন ফ্ল্যাটমালিকের তৎপরতায়। অথচ আট ফ্ল্যাটযুক্ত অন্তত চারটি বাড়ির ফ্ল্যাটমালিক তো বত্রিশ, এরই নাম বাবু-মেন্টালিটি। ঠিক আছে, দোলনায় দোল খেতে এসো—মজাটা বুঝিয়ে দেব তখন।

বজ্জাতগুলো তাও খেলছে? বেঞ্চিগুলোতে হল মস্তানগুলোর আড্ডা। তোদের খিস্তি শোনার জন্য তপোবন বানালাম? এবার পুলিশ ডাকব? নেশার ঠেক বানালি বেদিটাকে। মগের মুল্লুক? এই গাছগুলোর তলায় তোদের পুঁতে ফেলতে পারি রে।

অন্য ফ্ল্যাটগুলোর নিষ্ক্রিয় বাবুদের বাচ্চাগুলোই দেখছি বেশি দোল খাচ্ছে। আচ্ছা বেহায়া। তোদের বাপেদের তো পার্কের ব্যাপারে ডেকে পাওয়া যায়নি, একটা সই দিতেও কত বাহানা। আর এখন তোদের পাঠিয়ে দিচ্ছে দোল খেতে। খাওয়াচ্ছি। ট্রিপল তালা পড়ে গেল দোলনার শিকলিতে। দুই দোলনা এমনভাবে জড়িয়ে শিকলি, নে, এবার খা দেখি দোল।

বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে তালা খুলে শুধু তিন ফ্ল্যাটের ছেলেমেয়েরা দোল খায়। তাই খাবে হে।

একদিন এই নিয়ে ফাটাফাটি।

ঠিক আছে। দরকার নেই দোলনায়। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এমন তালা এবার। দোলনা এখন তালাবন্ধই থাকবে। দরকার হলে চিরতরে।

বছর তিনেকের মধ্যে দোলনা ঘিরে আগাছা। আগাছার বাড়। ওখানে সাপের বাসা হোক।

এখন সেখানে, সেই জংলা দোলনায়, কাগজকুড়ুনি ছেলেমেয়ে হাড়হাবাতেগুলো দোল খায়। মরচেপড়া তালাবন্ধ দোলনা ঠিক দোলে না, ঘুরপাক খায়। গদিকালোগুলো তবু ওর ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়ে। তেরছাভাবে দোল খেতে ওদের লজ্জা নেই। পারিসও বাবা। পরনে ধুকড়ি কানে মাকড়ি, চুল না ছল রে, তাতে লাল রিবন—কারা তোদের জন্ম দেয় রে।

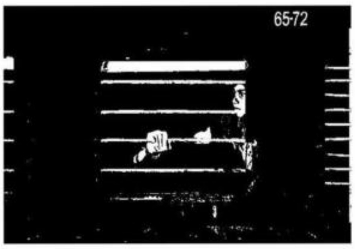

উত্তর বসন্ত

শচীন দাস

ট্রেনের কামরায় মুখোমুখি বসে।

বয়সে দু'জনেই প্রায় সমান। কিংবা বোধহয় ছোটই হবে ওই মহিলা। কিন্তু অসাধারণ রূপসী। একসময় যে রীতিমতো সুন্দরী ছিল সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। এখন উত্তর চল্লিশের ছোঁয়ায় সৌন্দর্য ভিন্ন পথে যাত্রা শুরু করলেও সুন্দরের আকর্ষণ এখনও তীব্র। তুলনায় ভদ্রলোক একটু চাপা। সুন্দর। তবে পুরুষোচিত নয়। এক ধরনের নারীত্বের লাবণ্য মেশানো। তা হলেও মেয়েদের চোখে না পড়ার মতো নয়। কিন্তু দুজনেই চুপচাপ। মাঝেমধ্যে এ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু অন্যমনস্ক। বাইরে তাকিয়ে এবং মুখের রেখায় দু'জনেরই গোধূলির বিষণ্ণতা। প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম অপরিচিত। কিন্তু একই সময়ের একই ট্রেনে দিনের পর দিন দুজনকেই মুখোমুখি বসতে দেখে কেমন সন্দেহ হল। এরা কারা—। স্বামী-স্ত্রী? নাকি অপরিচিত—। অপরিচিত যদি হয় তবে ঠিক একই সময়ে একই কামরায় একই জায়গায় মুখোমুখি কেন। আর পরিচিতই বা যদি হবে তবে কথা নেই কেন?

কৌতূহল হয়েছিল। নড়ে চড়েও বসেছিলাম। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারিনি। শুধু দেখেই গেছি দিনের পর দিন। একদিন আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। উঠেই আমাকে দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত। কিন্তু হঠাৎই জানলার দিকে চোখ পড়ায় চমকে উঠল। এবং তারপরেই আমাকে নিয়ে সটান পেছনের দিকে।

কী হল। অবাক হয়ে তাকাতেই বন্ধুর উত্তর, আমার পরিচিত। কিন্তু দেখলেই লজ্জা পাবে। তাই ....

আমি হাসলাম। লজ্জা কেন?

বন্ধু মাথা নাড়েন। ছেলেবেলার প্রেম। যৌবনে এসেও পরস্পরকে ছাড়তে পারেনি। আর এখন তো .....

সে কী! বিয়ে করেনি?

হয়ে ওঠেনি। সংসারের দায়-দায়িত্ব ছেড়ে আর এগিয়ে আসতে পারেনি মেয়েটি—

কিন্তু ভদ্রলোক।

অপেক্ষাই করে গেছে—

হোপলেস। কোনও মানে হয়? মুখ বেরোতেই বন্ধু অন্যমনস্ক, হয়ত হয় না। কিন্তু দু'জন দু'জনকে ভালবাসে প্রচণ্ড—

কিন্তু কথা বলে না কেন বলত। আর দু'জনে রোজ যায় কোথায়?

অফিসে। যায় একসঙ্গে। ফেরেও আবার একসঙ্গে .....

কিন্তু কথা?

বলে তো। তবে ফেরার সময়। যখন দুজন দুজনের কাছ থেকে বিদায় নেয়। মহিলা বলে, 'ভাল থেকো'। ভদ্রলোকের উত্তর, 'কাল যেন আবার দেখা হয়'।

আশ্চর্য।

সত্যিই আশ্চর্য।

বন্ধু নেমে গিয়েছিল। আর আমিও একসময় নামতে নামতে ভিড়ের ভেতরে তাদের খুঁজে ছিলাম। কিন্তু দেখা পায়নি। জানি দেখা হবে আবার। কাল সকালে। যখন তারা চুপ। কোনও কথা থাকবে না তাদের মুখে। বলবেও না কিছু। শুধু ফেরার সময়, দুজন দাঁড়াবে একবার, থমকে। মহিলাই বলবে তখন, 'ভাল থেকো'। ভদ্রলোকও তাকাবে। তারপরেই বলবে আবারও ভরাট গলায়, 'কাল যেন আবার ....'

আঁকি ঝুকি

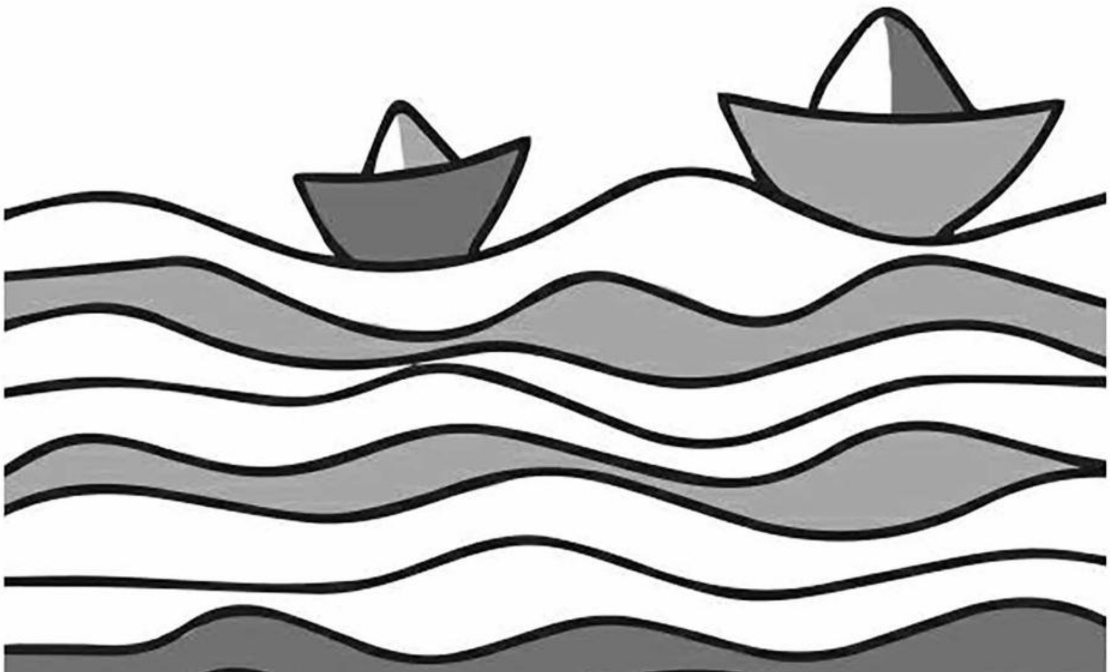

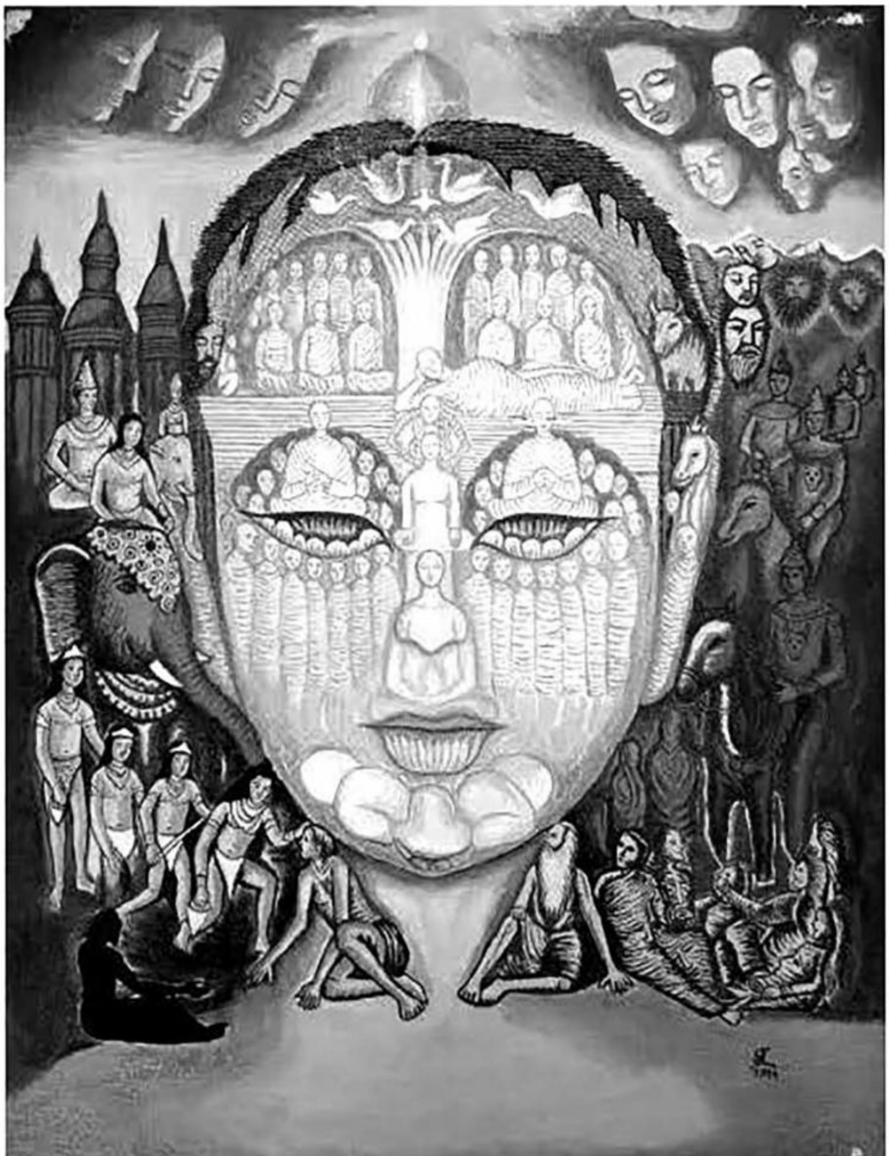

শিল্পী - বিদিশা মৌলিক

Title : Realization of Buddha

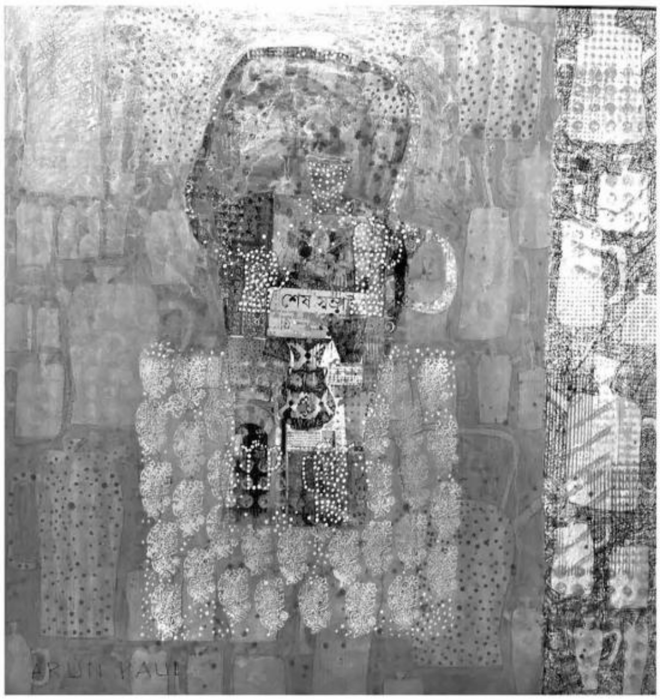

শিল্পী - অরুণ পাল

Title : Vase - I

শিল্পী - অরুণ পাল

Title : Vase - II

শিল্পী - সংযুক্তা পোদ্দার

Title : Friendship

শিল্পী - প্রিয়া রায়

Title : Dustbin - I

শিল্পী - অন্বেষক দাঁ

Title : Technique Batik

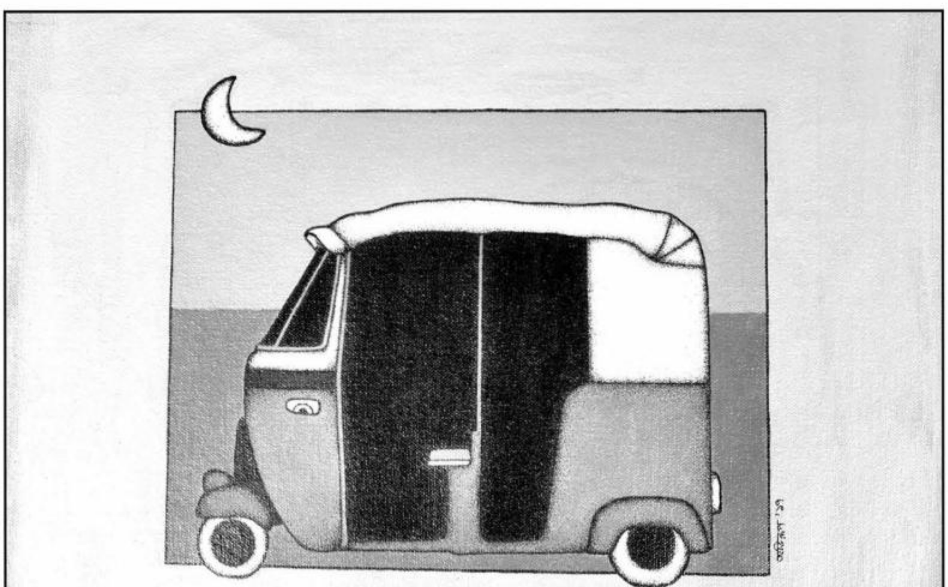

শিল্পী - অভিরূপ মৈত্র

Title : Untitled

শিল্পী - অরিন্দম সরকার Title : Couple

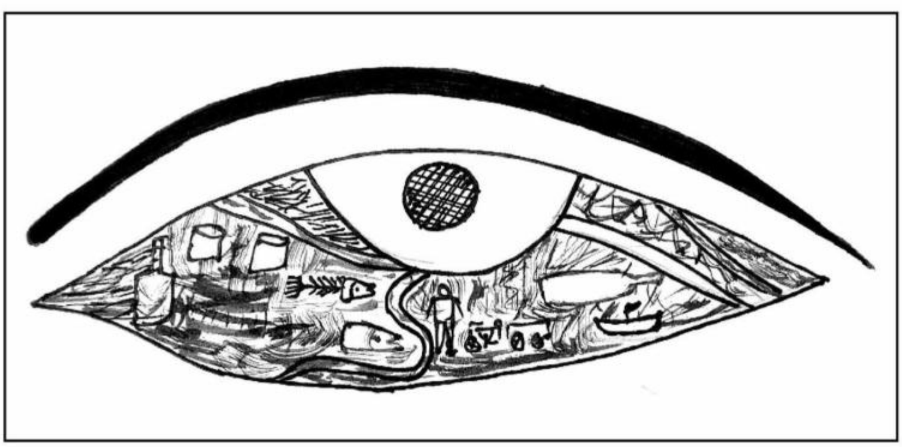

শিল্পী - বিশ্বজিৎ দেবনাথ Title : Dustbin - II

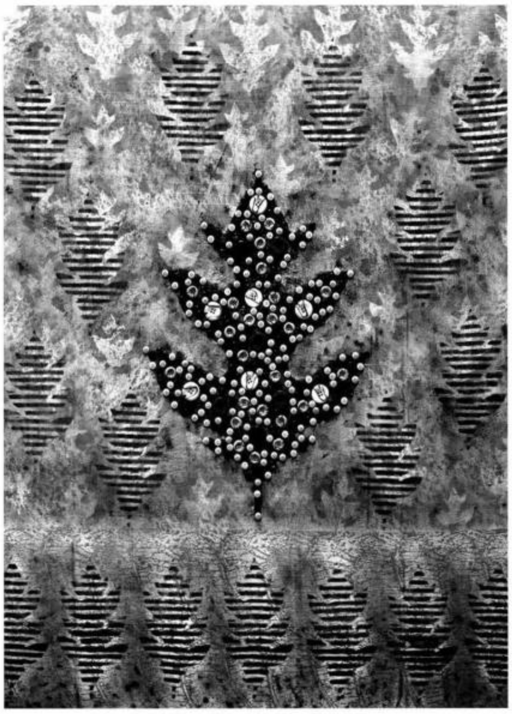

শিল্পী - অভিজিৎ দাস

Tile : Life

শিল্পী - লাকি মুখার্জী

Title : Dustbin - III

শিল্পী - সায়ন সাফুই

Title : Social Dustbin

শিল্পী - সুখেন্দু কুন্ডু

Title : End of Destiny